ভারতের সংস্কৃতির অবদান

শ্রী শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী



ভারতের সংস্কৃতির অবদান

ভারতের সংস্কৃতির অবদান

১৯।১এ, পঞ্চাননতলা লেন,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
১৯।১এ, পঞ্চাননতলা লেন,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৬৩

চিত্রশিল্পী :

শ্রীকিষণলাল ঘোষ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

মোহন প্রেস,
কলিকাতা-৯

পুস্তক মুদ্রণ :

শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

দাম : চার টাকা মাত্র

"সংস্কৃতি জীবনের সংগে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সংগে সংগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নতুন নতুন ভাব-পরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে, সমর্থও হয়েছে।......

* * *

নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয় বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলামও নয়, যা হচ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু ইসলামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা ধরনের খৃষ্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব নব শিল্প-সৃষ্টি, Socialism বা সম্পত্তিসাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানব-জাতি বা মানব সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।"

ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা—

জাতির গৌরবের পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতির পরিচয় প্রধানতঃ তার শিল্পে ও সাহিত্যে। শিল্প বলতে বুঝায় তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্যকলা প্রভৃতি। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর অবনমিত জাতিকে সংগঠিত, সুসংহত ও উন্নত করা প্রথম কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে জাতিকে আত্ম-সচেতন করার প্রকৃষ্ট উপায় তাকে তার ঐতিহ্যময় পূর্ব গৌরবের সংগে পরিচিত করিয়ে দেওয়া—যাতে ভারতের অনুপযোগী আপাত-মনোহর পরিণামে অশুভকর বিদেশীয় আকর্ষণের মোহে নিজেদের অমূল্য সম্পদ অবহেলিত ও ক্রমে বিনষ্ট না হয়।

এই লক্ষ্য নিয়ে লেখা "ভারতের সংস্কৃতির অবদান"। দেশের বিশেষতঃ জাতি সংগঠন ও সমাজসেবার প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে লাগলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হবে।

তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন স্নেহাস্পদ অধ্যক্ষ শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র দাশ, এম. এ., গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আলোকনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীমান নিখিলরঞ্জন দাশ, বি. এ., গীতভারতী। যাদের সাহায্য না হলে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে বইটি লেখা সম্ভবপর হত না তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বারিদবরণ চক্রবর্তী, বি. এ., শ্রীমান্ তারকেশ্বর ঘোড়ই ও শ্রীমান্ নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

লেখক

ইতি—ইং ১৫।৮।৬৩


সূচীপত্র

চিত্র সূচী

———

"তুমি সুন্দর, যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি
দৈন্যভরণ বৈভব তব অপচয়পরিপূর্তি ॥
নৃত্যগীত কাব্যছন্দ কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ—
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমাস্ফূর্তি ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রীমা
রানী রাসমণি
বিবেকানন্দ
কর্মযোগী বিধানচন্দ্র
রবীন্দ্রায়ণ
জাতির জনক যাঁরা
জাগ্রত মেদিনী
সেকালের গল্প
শের পাহাড়ের বনে
সুখী কে
বড়দের গল্প (৮ম খণ্ড)
জাগে নব ভারতের জনতা (২য় খণ্ড)
শিক্ষার নূতন পথে

ইত্যাদি

ভারতের সংস্কৃতি

শহর হতে দূরে একটি পল্লী। ঠিক দুপুরবেলা। কোথাও কোন কোলাহল নেই।

এক চাষীভাই আর তার বৌ। সকালের কাজকর্ম সেরে দুপুরের খাওয়ার নিয়ে বসবার যোগাড় করছে। খাওয়ার আর কি! নুন ভাত আর একটু কল্‌মী শাক সিদ্ধ।

এমন সময় দুটি ভদ্রলোক সেই পথে যেতে যেতে আশ্রয় চাইলেন। তাঁরা দু'জনেই খুব শ্রান্ত ক্লান্ত।

অতি কষ্টে সংগ্রহ করা সারাদিনের খাওয়ার ছেড়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অতিথিদের বসবার জন্যে ছেঁড়া ময়লার মধ্যে সবচেয়ে ভাল চাটাইখানি পেতে দিল। হাত মুখ ধোয়ার জল দিল। সেই সংগে ভাবতে লাগল, কি খেতে দেবে। সেই নুন ভাত ত দিলই, আর কোথায় কি অসময়ের জন্য লুকানো ছিল সবই ধরে দিল তাঁদের সামনে। মিষ্টি কথায়, মিষ্টি ব্যবহারেই অতিথিদের সব শ্রান্তি চলে গিয়েছিল। যে অন্ন হয়ত কখনো তাঁরা মুখে দেননি তাই পরম তৃপ্তির সংগে খেয়ে নিলেন।

এই যে আতিথেয়তা, মিষ্টি কথা ও নিজেদের মুখের গ্রাস ছেড়ে দেওয়া এতেই ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতির পরিচয়। অবশ্য এটি একটি নমুনা মাত্র।

ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিক শহরের ভদ্রলোক গৃহস্থ হলে হয়ত ঠিক এ রকম করতেন না। অসময়ে খবর না দিয়ে আসাটা অন্যায় মনে করে বিরক্ত হতেন, এবং অতিথিরা যাতে শীগ্‌গির চলে যান কথাবার্তায় আচরণে সে রকম চেষ্টা করতেন। কিন্তু এটি মোটেই ভারতীয় নয়, সে কথা পল্লী-ভারতকে যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চিত অনুভব করবেন।

সংস্কৃতির মানে ঃ

সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি, মানুষের কথায় ও কাজে, সকল রকম আচরণে যা কিছু তার অন্তরের দীপ্তি ও ছন্দের গভীরতার পরিচয় দেয়। এটা মোটেই বাইরের জিনিস নয়। মার্জিত অন্তরের বাইরের প্রকাশ। কোন কোন পণ্ডিত সংস্কৃতির মানে করেছেন 'মার্জিত মানসিকতা'; মনের এই পরিমার্জনা বা সংস্কার আধ্যাত্মিকতারই প্রমাণ। এই পরিমার্জিত মন বা আধ্যাত্মিক বোধই রূপ লাভ করে শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি চারুকলায়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে

আত্মার এই 'পূর্ণতার সাধনা' বিভিন্ন বিশিষ্ট ও বিচিত্র রূপ ধারণ করে। সুতরাং যেখানেই সেই সাধনার বিশেষ প্রকাশ হয়—সেটা আফ্রিকার কালো কাফ্রিদের মাঝেই হোক অথবা ইউরোপের সুসভ্য সাদা গ্রীকদের মাঝেই হোক—আমরা শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পারি না। যে শ্রদ্ধা আমরা দেখাই সেটা জাতিকে নয়, তার সাধনাকে।

ভারতের আদর্শ ঃ

এই সংস্কৃতির পিছনে আছে 'সত্য, শিব, সুন্দর'। এই তিনের মধ্যে 'সুন্দর' আমাদের সকল কাজের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্তরের মাঝে এই সুন্দরের অনুভূতি নরনারীকে সুন্দর কাজে প্রণোদিত করে। ভারতের আদর্শ এই 'সুন্দর'কে সৃষ্টি করা, এবং সেই সৃষ্টির ফলে চরম আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া। তার সাহিত্য, তার চারুশিল্প, তার স্থাপত্য, তার ভাস্কর্য, তার চিত্রকলা, তার নৃত্য—সব কিছুর মধ্যে এই সুন্দরের পূর্ণ প্রকাশ, এবং এদের উৎকর্ষের বিচার হয় এদের মধ্যে 'এই সুন্দর' কতখানি বিকশিত হয়েছে তার উপর। পরবর্তী অধ্যায়ে এইগুলির আলোচনা করা হচ্ছে।

শিল্পকলার প্রয়োজন

সৃজনের প্রেরণা ঃ

আমরা এবং এই বিশ্বের সব কিছুই পরম স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষকেও তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সৃজন করার বাসনা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই বাসনার বা ইচ্ছার এক প্রকার পরিণতি হয় শিল্পে। যে শিল্প তৈরি করে তাকে বলা হয় শিল্পী। এই বিশ্বের স্রষ্টাও মহাশিল্পী, তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী আর কেউ নেই। তাঁর সৃষ্টির অনুকরণে মানুষও সৃজন করে। সকল শিল্পের গোড়ায় আছে এই সৃজনের প্রেরণা।

সৃজনের প্রয়োজন ঃ

মানুষ-শিল্পী সৃজন করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য প্রয়োজন বোধে। এই প্রয়োজন দুই রকমের। মানুষের বাঁচবার জন্য খাদ্য সংগ্রহের মতো শিল্প তৈরি করাও প্রয়োজন। কিন্তু যেমন দেহের খোরাক দরকার, তেমনি আবার দেহকে চালায় যে মন তাকে সজীব রাখার জন্য মনের খোরাকও দরকার। এই মনের সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত করার জন্যও শিল্প-কলার প্রয়োজন হয়। বাড়ি, ঘর, নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র যেমন বাঁচবার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয়, তেমনি মনের

চাহিদা মিটাবার জন্য ছবি, নাচ, গানেরও প্রয়োজন হয়। এই দুই রকম শিল্পকেই স্থায়ী ও সুন্দর করার জন্য যে প্রয়াস, তাই প্রকাশ পায় স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে চিত্রে, সংগীতে, নৃত্যে ও সাহিত্যে।

এখানে বলে দিচ্ছি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বলতে কি বুঝা যায়। ঘরবাড়ি, মন্দির ইত্যাদি স্থাপন করবার অর্থাৎ গড়ে তুলবার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে তাকে কাজে পরিণত করা হল স্থাপত্য (গৃহ-নির্মাণ শিল্প)। আর ভাস্কর্য হল পাথরে খোদাই করে দেবদেবীর মূর্তি, মন্দিরের দৃশ্য এবং অন্য রকমের ছবি ফুটিয়ে তোলা অর্থাৎ মূর্তিশিল্প। যিনি স্থাপত্যের কাজ করেন, তাঁকে বলা হয় স্থপতি এবং যিনি ভাস্কর্যের কাজ করেন, তাঁকে বলা হয় ভাস্কর।

সমাজ ও শিল্প ঃ

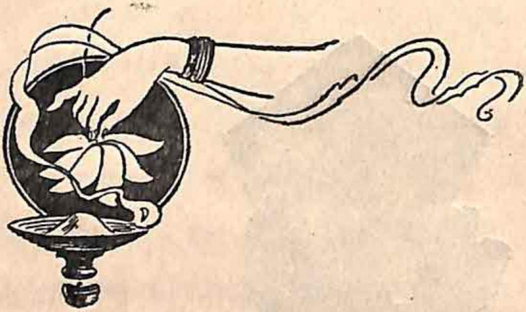
শিল্পী তৈরি বাড়ি দেখে নানা কথা হয়।
এটা সেটা হেথা হোথা না দিলে কি নয়॥
তোমার কাছে যা কিছু মনে হয় বাজে।
ভেবে দেখলে বুঝবে সবি লাগে কাজে॥
ওই সব বাড়িটিকে রাখে টেনে ধরে।
শিল্পী জানে তত্ত্ব কথা জানে কি তা পরে॥

ইংরাজ কবির একথা খুবই সত্য। আদিম অবস্থায়,

বনে জংগলে পাহাড়ে পর্বতে মানুষ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত, তা আজ সভ্য সমাজে শুধু যে শোভা পায় না তা নয়, মানুষ তাতে তৃপ্তি ও আনন্দবোধ করে না, করতে পারে না। কারণ সে এখন জংলী বা পাহাড়িয়া নয়, সে এখন সুসভ্য, অন্ততঃ নিজেকে তাই মনে করে গর্ব অনুভব করে। তা ছাড়া, মানুষ এখন একলা বা একটি পরিবার নিয়ে বাস করতে চায় না, সমাজের মধ্যে বাস করতে চায়। মনীষীরা মানুষের সমাজ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে সমাজ সৃষ্টির মূলে আছে এক সংগে আনন্দ উপভোগ করবার স্পৃহা, বহুর ভিতর দিয়ে এককে আস্বাদ করা এবং একের ভিতর বহুর আস্বাদ করা। মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, যা তাকে আপন কেন্দ্র থেকে বিশ্ব-কেন্দ্রে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণই রয়েছে সমাজ সৃষ্টির মূলে। এই আকর্ষণই মানুষের সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তিকে সমাজের সেবায় নিয়োজিত করে। শিল্পকলা সৃষ্টির মূলেও নিজের ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ অপেক্ষা সমাজের মধ্যে সবকে নিয়ে আনন্দ আস্বাদ করার আকুল স্পৃহা থাকে। তাই সমাজে শিল্পকলার এত প্রয়োজন ও প্রসার।



ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য



"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে ওংকার ধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান্—যাদের নাম অবিনশ্বর।"

—**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**

অনার্য সিন্ধু সভ্যতার যুগ ঃ

সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার ইতিহাসের মাল-মসলা ভাল রকম পাওয়া না যাওয়ায়, সে সময়ের ইতিহাস ঠিক মতো লেখা যায় নি। কিন্তু কিছুদিন আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মাটি খুঁড়ে মহেনজো-দড়ো ও হরপ্পা এ দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ বের করা হয়েছে। তা থেকে যে সভ্যতার কথা জানতে পারা গিয়েছে, তাতে বেশ বোঝা যায় যে ঐ অঞ্চলের স্থপতি ও ভাস্কররা খুব উন্নত ধরনের শিল্প স্থষ্টি করতে পারতেন। সিন্ধী ভাষায় এই মহেনজো-দড়ো মানে 'মৃতের স্তূপ'। বোধ হয় শহরটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পাশের অঞ্চলের লোকেরা তার এই নাম দিয়েছিল। এটি সিন্ধু প্রদেশের ভিতর লারকানা জেলায়। হরপ্পা এই জায়গা থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে, পাঞ্জাবের মণ্টেগোমরী জেলায়।

দুটি শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এখনকার মতো পাকা ইটে তৈরি এবং বেশ একটা পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি। এই পরিকল্পনা শহরের লোকের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই করেছিলেন নিপুণ শিল্পীরা। জল নিকাশের পাকা ড্রেন, বাড়িতে বাড়িতে স্নানের ঘর, কোন কোন বাড়িতে পাকা পায়খানাও

ছিল। পাকা ইটে গাঁথা বড় বড় অট্টালিকা দেখা যায়। মহেনজো-দড়োতে জনসাধারণের জন্য যে স্নানাগার ও সন্তরণ-বাপী আবিষ্কার হয়েছে, জগতে যে কোন সভ্য দেশ সেরূপ শিল্পের উৎকর্ষ নিয়ে সভ্যতার গর্ব করতে পারে। একটি চতুষ্কোণ খোলা জায়গা, তার চারদিকে বসবার গ্যালারী এবং কামরা ছিল। তার মাঝখানে ছিল একটি আট ফুট গভীর ৩০ ফুট × ২৩ ফুট স্নানের বড় চৌবাচ্চা। উপর থেকে নিচে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। পাশে পাশে কূঁয়া, ক্ষর জল এই চৌবাচ্চাটি সব সময় ভরিয়ে দিত। উপরের সুন্দর কাঠের দোতলা ঘর।

আর্য সভ্যতার যুগ ঃ

এ সব শিল্পের নিদর্শন খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার, এর পরের অর্থাৎ ঐ তিন হাজার বছর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের গৌরবের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যদিও সে যুগে বিদ্যা, কৃষ্টি ও সভ্যতার গৌরব বিরল নয়। এর প্রধান কারণ তিনটি। প্রথম, যে সব জিনিস দিয়ে বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরি হত—মাটি, কাঠ, বাঁশ—তাতে শত শত বৎসর টিকতে পারে এমন জিনিস তৈরি করা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়, সে যুগের নরনারী সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করতেন। তাদের সমস্ত সময় আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই কেটে যেত। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, সে কালের মানুষ ধর্মের জন্য সব অনুষ্ঠান করতেন, তার জন্য প্রয়োজন না হলে শিল্পীর পক্ষে কোন কিছু তৈরি করার প্রয়োজন হত না। বৈদিক যজ্ঞের জন্য যজ্ঞবেদী, যজ্ঞশালা প্রয়োজন হত। এই বেদী নানারূপে তৈরি হত। বাজপাখী, রথ বা ঊর্ধ্ব-বাহু মানুষ এ রকম নানা আকারে তৈরি হত। এ সবই হচ্ছে বৈদিক যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। মালাবার প্রদেশে ক্যানানোরে এরূপ একটি অর্ধ-চক্রাকৃতি যজ্ঞবেদী একটি গুহার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। তার মাঝ থেকে ধূঁয়ো বের করার জন্য চিমনীর মতো ব্যবস্থা ছিল দেখা যায়, ঐ প্রদেশেই পাহাড়ে কাটা সমাধিস্থানও আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি সমাধির উপর একটি সোনার পাতায় পৃথিবী-দেবীর নগ্ন মূর্তি অংকিত পাওয়া গিয়েছে। ঋগ্বেদে অট্টালিকার উল্লেখও পাওয়া যায়।

এর পর বিম্বিসারের (খৃষ্টের আগে ষষ্ঠ শতাব্দী) রাজধানী রাজগৃহের স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ঐ শহরের দুর্গ-প্রাচীর এবং ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ, যা বিহারে বর্তমান রাজগীরে পাওয়া যায়, তা খুব

সৌখিন ধরনের না হলেও খুব শক্ত ও মজবুত। সে রকম স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত সে যুগে আর কোথায় পাওয়া যায় না। এই বিম্বিসারই 'গিরিব্রজ' নামে শৈল-দুর্গ তৈরি করেছিলেন। তাঁর নতুন রাজধানী রাজগৃহ তৈরি করেছিলেন মহাগোবিন্দ নামে বিখ্যাত শিল্পী। বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর সত্তপন্নি গুহার সামনে এক বিরাট মণ্ডপ তৈরি করিয়েছিলেন। সেখানে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সমাবেশ হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা সেখানে তিনি করিয়েছিলেন।

মৌর্যযুগ ঃ

এর পর মৌর্যযুগের গৌরবময় স্থপতি-বিদ্যার কথা বলা যেতে পারে। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরি ছিল। প্রাসাদের থামগুলি সোনা ও রূপার তৈরি, শিল্পীর আঁকা দ্রাক্ষালতা ও পাখী দিয়ে সাজানো ছিল। এখন সেই প্রাসাদ নেই। কিন্তু সেই সময়ে যে গ্রীকরা এসেছিলেন তাঁরা এর ভাস্কর্যকে সেকালের জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। এই প্রাসাদের সংগে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের তুলনা করা হয় এবং অনেক বিদেশী

ঐতিহাসিক পারস্যের প্রাসাদের উপর ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

তারপর তাঁর পৌত্র অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদ, যা এখন গঙ্গা নদী ও শোন নদের পলিমাটীর নিচে লুকানো আছে। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারশ' বছর পরে চীন দেশ থেকে ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। তিনি সেই প্রাসাদ দেখে যা লিখে গেছেন, তা তখনকার স্থাপত্যের গৌরবময় বর্ণনা। 'পাথরের স্তূপ জড় করে দেওয়াল ও তোরণ-দ্বার এমন করে গেঁথেছে এবং ভাস্কর্য শিল্প এমন সুন্দর ও সুনিপুণ ভাবে আঁকা হয়েছে, যা এ যুগের কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ সব কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তৈরি হয়ে থাকবে।' ওই প্রাসাদের সামান্য যে দু'একটা অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখলে মনে হয় ফা-হিয়েনের ওই কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।

বৌদ্ধযুগ ঃ

এই সঙ্গে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই যুগে অনেকগুলি স্তূপ ও চৈত্য তৈরি হয়েছিল। চৈত্য

কথাটা প্রথম এসেছিল 'চিতা' থেকে, অর্থাৎ প্রথম প্রথম কোন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ বা ভিক্ষুর দেহাবশেষের উপর যা কিছু তৈরি হত তাকেই বলত চৈত্য। কিন্তু পরে যে কোন স্তূপ বা মন্দিরকে চৈত্য বলা হত। সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপ পাওয়া গিয়েছে নেপালের সীমান্তে। ইট দিয়ে তৈরি, ভিতের ব্যাস ১১৬ ফুট, উঁচু ২২ ফুট, একটি বিরাট পাথরের আধারের উপর তৈরি, যে আধারের মধ্যে বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহাবশেষ আছে। বিশেষজ্ঞ বৈদেশিকরা এই স্তূপের স্থাপত্যের অনেক প্রশংসা করেছেন এবং সেই সংগে আধারের উপর সোনা, রূপো, প্রবাল এবং আর যে বহু মূল্য পাথর খচিত আছে, তা অতি উঁচু ধরনের চারুশিল্প বলে মন্তব্য করেছেন। এই স্তূপের উপর যা লেখা আছে, তা থেকে মনে হয় এটা শাক্যদের তৈরি, একত্রাট সেই আটটি স্তূপের মধ্যে একটি, যেগুলি তৈরি হয়েছিল বুদ্ধদেবের পূতাবশেষ রাখবার জন্যে।

সম্রাট্ আশোক অনেকগুলি সুন্দর স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহার তৈরি করেছিলেন।

কাশীর নিকট সারনাথের 'সিংহচূড়' দেখে সকল শিল্পী শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দেয়। ঐ সিংহচূড়ে আছে চুটি সিংহ, ধর্মচক্র, একেবারে নিচে উল্টোভাবে বসানো

পদ্ম। আরও দুটি ও-রকম সিংহ ছিল, তা এখন লণ্ডন যাদুঘরে আছে। দু'জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ বলেছেন



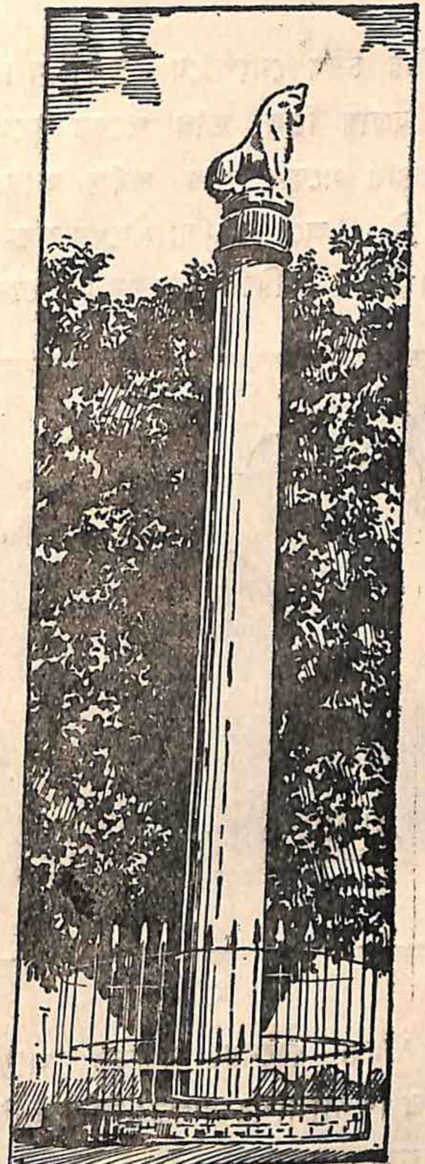
সারনাথের সিংহচূড় (অশোকস্তম্ভ শীর্ষ)

যে, প্রাচীন জগতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস আর তৈরি হয় নি, এবং এর সমকক্ষ জন্তু-ভাস্কর্যের নিদর্শনও অন্য কোন দেশে পাওয়া কঠিন। তাঁরা শুধু এই সিংহচূড়ের

প্রশংসা করেন নি, সমগ্র মৌর্য শিল্পকলার সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কারুকার্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। স্থাপত্যের চেয়ে ভাস্কর্যেই মৌর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকাল ঃ

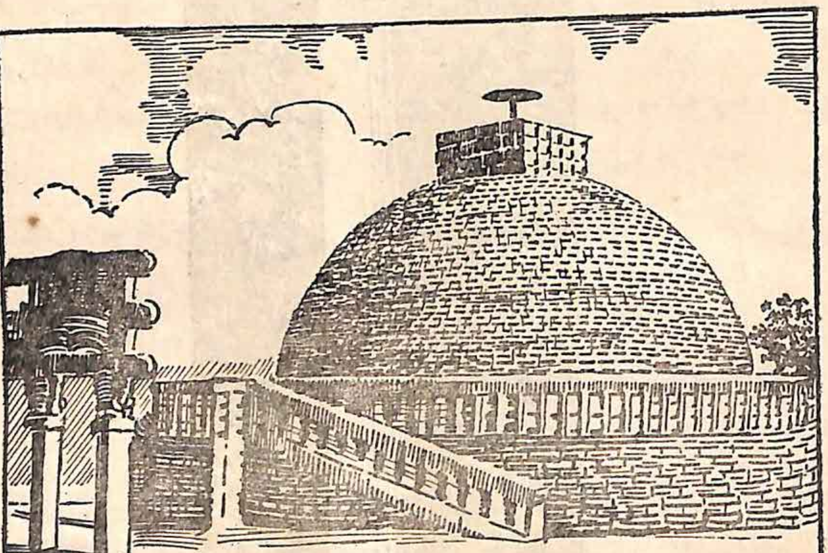
অশোকের সময়ে চল্লিশটিরও বেশী প্রস্তর-স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপরে একটি চূড়া ও চূড়ার উপরে একটি জন্তু। চূড়াটি একখানি পাথরের তৈরি, বাকী সমস্ত স্তম্ভটাই আর একখানা পাথরে গড়া, এই অশোক স্তম্ভগুলির মধ্যে নন্দনগড়ের স্তম্ভটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এটি একেবারে একখানা পাথরে তৈরি, পালিশ অতি সুন্দর, লম্বাও প্রায় ৩৩ ফুট। ব্যাস নিচে ৩৫½ ইঞ্চি এবং উপরে ২২½ ইঞ্চি। অশোকের শিল্পী ও প্রস্তর ছেদকদের কিরূপ অসামান্য নিপুণতা ছিল, তা জানা যায় নন্দনগড়ের মতো বড় বড় এমন কি তের চৌদ্দ শ' মণের স্তম্ভ তৈরি করা, তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, তাকে সোজা করে দাঁড় করানোর ব্যবস্থার কৌশল থেকে। তাঁরা যে কোন দেশের যে কোন যুগের শিল্পীদের সমকক্ষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মৌর্যযুগের কয়েকশত বৎসর পূর্বেই পাথর কাটা ও তাকে পালিশ



নন্দনগড়ের অশোক-স্তম্ভ

২

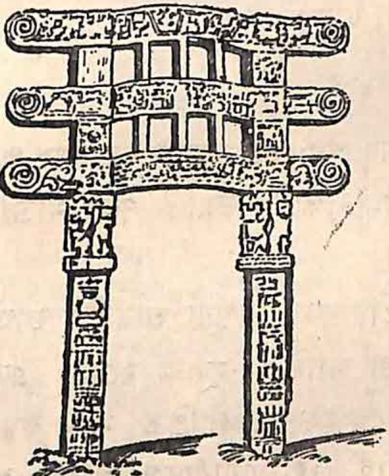
করা উন্নতির চরম সোপানে উঠেছিল। মৌর্যযুগে সে উন্নতি বজায় ছিল, তার পরের যুগেও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশী উন্নতি হয় নি। অশোক সন্ন্যাসীদের জন্য পাথর কেটে সুন্দর গুহা তৈরি করিয়ে দিতেন। তার ভিতরকার



সাঁচি-স্তূপ

পালিশ উন্নত ধরনের, কাচের আয়নার মতো। অশোকের শিলালিপির অক্ষরগুলিও অতি নিখুঁতভাবে খোদাই করা।

সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপ দুটির শিল্পকলা মৌর্য-যুগের না হলেও তাতে সেই যুগের ধারাই প্রকাশ পাচ্ছে। এই দুটি স্তূপের ভাস্কর্যে জাতকের গল্পে যেমন আছে, তেমনি ভাবে বুদ্ধের জীবনীর ছবি বেশ আবেগ ও সরলতার সংগে খোদাই করা হয়েছে। সাঁচি স্তূপের অসামান্য কারুশিল্পের চারটি তোরণ দ্বার ভারতীয়



সাঁচি-স্তূপের একটি তোরণ দ্বার

শিল্পকলা সেকালে কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপের চারিদিকে রেলিংয়ে নানারকম সুন্দর ভাস্কর্য ফুটে উঠেছে। শিল্পীরা সে সময়ের জীবনের ছবি বাস্তবের সংগে মিলিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দুইটি স্থানের শিল্পকলার মধ্যে

বৌদ্ধ ভাব থাকলেও বৌদ্ধ ধর্মের বৈরাগ্যের ছবির পাশাপাশি জীবনের পূর্ণ আনন্দলাভের সুরুচি সঙ্গত ভাস্কর্য পরিস্ফুট হয়ে আছে।

সম্প্রতি বকসারের নিকট মাটী খুঁড়ে খৃষ্টের প্রায় তিন হাজার বছর আগের নগরীর যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকেও প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগ ঃ

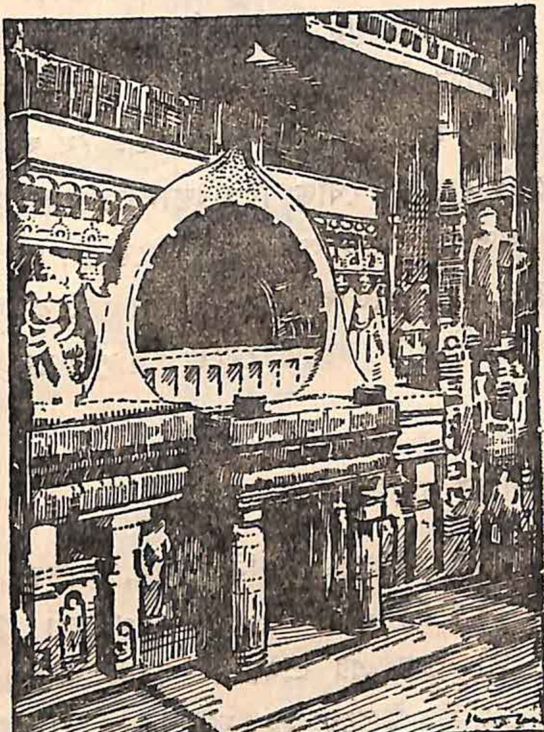
মৌর্যযুগের পর গুপ্ত সম্রাটদের সময় পর্যন্ত ভারতের স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের উন্নতি পুরা মাত্রায় বজায় ছিল দেখা যায়।

অমরাবতীর কলা-নৈপুণ্য ভারতীয় ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তা আদি-রস-মূলক হলেও এত সুন্দর যে, তার বর্ণনা কেউই অতিরঞ্জিত মনে করতে পারবেন না। অজন্তার গুহা মৌর্যযুগে আরম্ভ হলেও গুপ্তযুগ পর্যন্ত তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এ সময়ে গান্ধার ও মথুরা শিল্প বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে বিখ্যাত হয়ে আছে।

গুহা নির্মাণ শিল্প ঃ

গুহা নির্মাণ শিল্প গুপ্ত সম্রাটদের সময় কত উন্নত হয়েছিল, তার প্রমাণ বোম্বাই ও পুণার মাঝে

লোনাভলার নিকট কার্লে গুহা। এই গুহার ভিতর উপাসনার জন্য ঘর ছিল, ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, ৪৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু। দুই দিকে ১৫টি করে ত্রিশটি থাম।



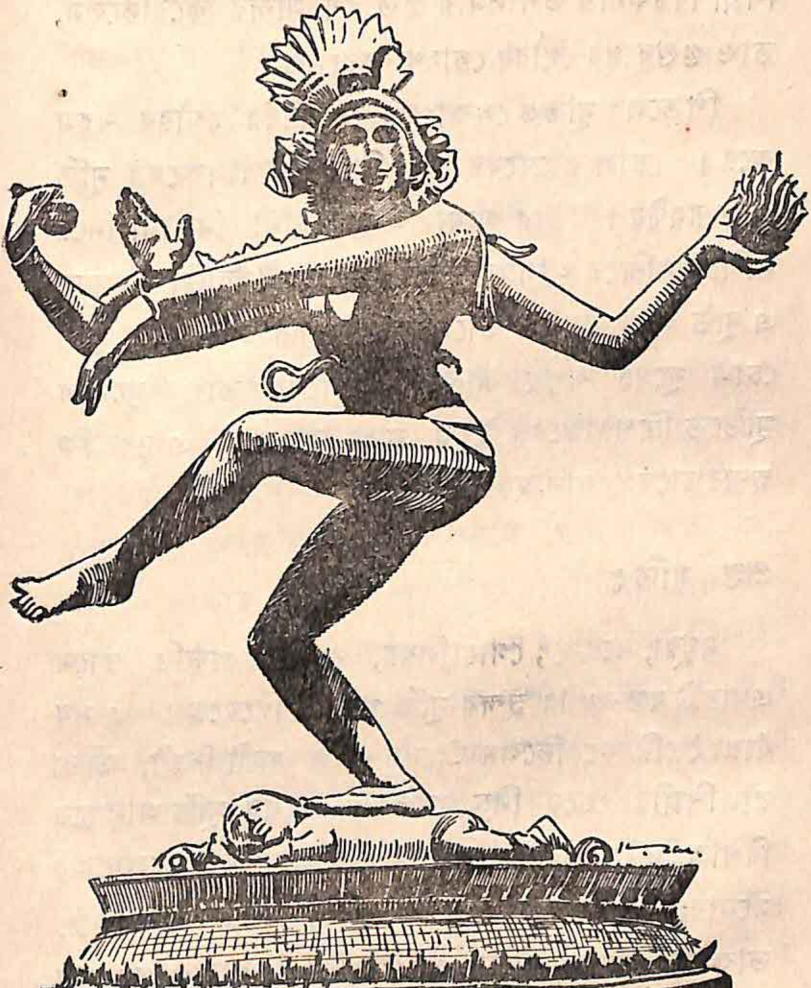
অজন্তার মহাযান চৈত্য

থামের উপরকার চূড়ায় নানা রকমের সুন্দর কারুকার্য। গুহাগুলি তৈরি হত সাধুদের জন্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য, তাঁরা লোকালয় হতে দূরে শান্তিতে ধর্ম ও বিদ্যার

চর্চা করতেন। তাঁরাই নিজাম রাজ্যের মধ্যে অজন্তা খুঁজে বের করেন। খৃষ্টের আগে তিন শ' বছর ও পরে সাত শ' বছর, মোট হাজার বছর ধরে এই গুহায় চারটি সমবেত উপাসনার গৃহ 'যাদের চৈত্য বলা হত' তৈরি হয়। এ ছাড়া সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য—পঁচিশটি বিহার তৈরি হয়। পাহাড় কেটে এই যে ঘর তৈরি হয়, তাতেই হয়েছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যবহার ও যত্নের অভাবে জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীতে প্রায় হাজার বছর পরে এক ইংরেজ সেনানায়ক শিকার করতে যেয়ে এই লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করেন।

লৌহ ও পিত্তল ভাস্কর্য ঃ

শুধু ইটের পাথরের জিনিস নয়, ধাতুর তৈরি জিনিসের উৎকর্ষের জন্যেও গুপ্তযুগ বিখ্যাত। দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহ-স্তম্ভ এর প্রমাণ। স্তম্ভটি মাটির নিচে ২০ ইঞ্চি ও মাটির উপরে ২২ ফুট এবং ব্যাস নিচের দিকে ১৬ ইঞ্চি ও উপর দিকে ১২ ইঞ্চি। দেড় হাজার বছর রোদ, জল, হাওয়া লেগেও এতে এতটুকুও মরচে ধরেনি। নালান্দায় আশি ফুট উঁচু তামার এক বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। ইলোরার শিল্পীরা মিলে দেব



তাঞ্জোরের নটরাজ মূর্তি

শিল্পী বিশ্বকর্মার উপাসনার জন্য যে মন্দির করেছিলেন, তাও গুপ্তযুগের গৌরব ঘোষণা করছে।

পিতলের মূর্তিও সেকালের ভাস্কর্যের গৌরব বহন করে। চোল রাজাদের সময় শিবের উপাসকদের মূর্তি অতি রমণীয়। তার মধ্যে আপ্পা স্বামী নিড়ানী নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে আগাছা উঠাবার জন্য তীর্থযাত্রা করছেন, এ মূর্তি অতুলনীয়। তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজের মূর্তি চোল যুগের অপূর্ব কীর্তি। মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যের মূর্তিতে ত্রিপুরাসুরের উপর নৃত্য করছেন, এ দৃশ্য কি সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে।

প্রস্তর মূর্তি ঃ

মথুরা, বরোদা, গোয়ালিয়র, পাটনা প্রভৃতি স্থানে এগারটি যক্ষ-যক্ষীর সুন্দর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এ সব যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁদের বলত পল্লী-শিল্পী, তাঁরা রাজশিল্পীর চেয়ে নিচু স্তরের। এ সব মূর্তি আকারে বিশাল এবং পল্লীর শিল্পীদের দ্বারা পল্লীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি। এদের মধ্যে সবগুলিতে ভাস্করের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পরিস্ফুট না হলেও এগুলির সৌন্দর্য কম নয়।

সাঁচিতে সুন্দর অপ্সরা মূর্তি আছে। এটিকে অপ্সরা

না বলে বরং বৃক্ষ-দেবতা বা বৃক্ষিকা বলাই ঠিক। গন্ধর্বরা বা অপ্সরারা গাছে বাস করেন, এ বিশ্বাস সেকালে ছিল, তাই মহাভারতে আছে—

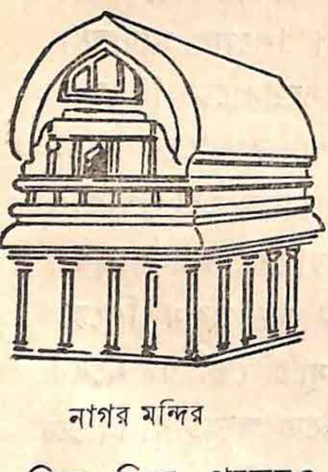
কে তুমি কদম্ব তরু নত করে ধরা।
দেবতা বা যক্ষী কিংবা দানবী অপ্সরা॥

গান্ধার ও মথুরার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট মূর্তিও তৈরি করতে পারতেন। প্রাচীন গান্ধার বলতে আমরা বর্তমান আফগানিস্থান অঞ্চলকে বুঝি। এই অঞ্চলেও অনেক ভাঙ্গা, আধাভাঙ্গা ও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর সুন্দর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলি মোটামুটি গান্ধার অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে বলে এই ভাস্কর্যকে 'গান্ধার শিল্প' বলা হয়। গান্ধার শিল্পের পরই মথুরা শিল্পের প্রাধান্য। এই দুই শিল্পের বুদ্ধমূর্তি ও জৈন সম্প্রদায়ের জিনদের মূর্তি অনেক পাওয়া যায়। শক কুশান রাজাদের মধ্যে কনিষ্ক প্রভৃতির মধ্য এশিয়ার পোষাক-পরা পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরি হয়েছিল। জৈন আয়াগপট্টের ঐ রকম নারী-মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এই দুই রকম শিল্পের মধ্যেই নরনারীর নানা ভঙ্গিমার মূর্তি তৈরির অনেক নিদর্শন আছে। মূর্তিগুলি প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত বা বিচিত্র মনে হলেও ধর্মের প্রতি অনুরাগের কথাই মনে করায়।

মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

তিন রীতি ঃ

ভারতের শিল্প-শাস্ত্রে মন্দির তৈরির তিন রকম রীতি দেওয়া আছে। নাগর, দ্রাবিড় এবং বেসর। 'নাগর' রীতির বিশেষত্ব এই যে, নিচ হতে উপর পর্যন্ত আগাগোড়া চতুষ্কোণ। 'দ্রাবিড়' আটকোণে এবং 'বেসর' গোলাকৃতি। সাধারণভাবে ওদের লক্ষণ নিচের ছবিতে দেখানো হল। কিন্তু স্থানে স্থানে



নাগর মন্দির



দ্রাবিড় মন্দির



বেসর মন্দির

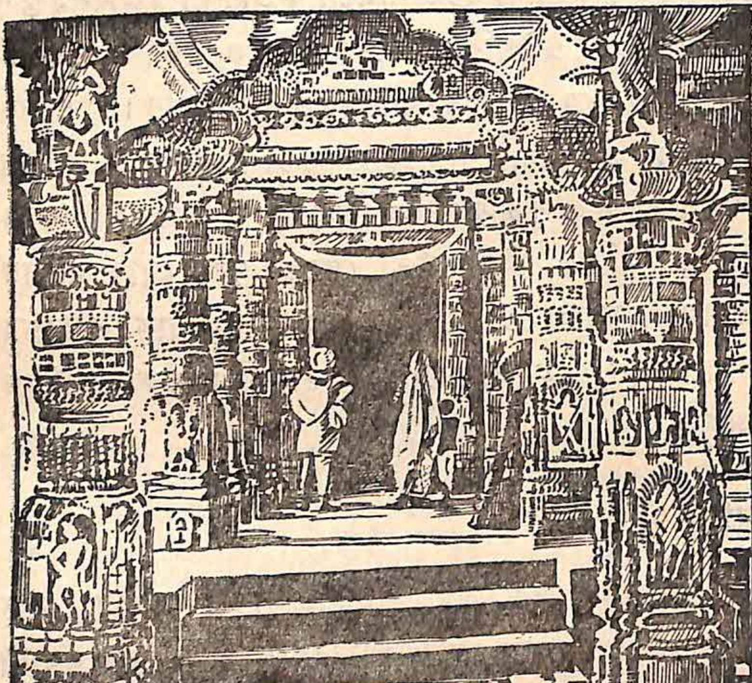
কিছু কিছু প্রভেদও দেখা যায়। কোথাও কোথাও এই দুই বা তিন রকমের মিশ্রণও দেখা যায়।

নাগর মন্দিরের উপরে শিখর বা চূড়া থাকে। উত্তর ভারতে এইরূপ মন্দিরই বেশী। দ্রাবিড় রীতি ভারতের দক্ষিণ দেশে দেখা যায়। দ্রাবিড় দেশ মোটামুটি কৃষ্ণা নদী হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। দ্রাবিড় রীতিতে তৈরি মন্দির কোথাও কোথাও আট-কোণে না হয়ে ছ'কোণেও আছে দেখা যায়। ওদের বিশেষত্ব এই যে, উপরের দিকটা মিশরের পিরামিড অর্থাৎ খুব সরু সূঁচ-মুখ কলার মোচার মতো। বেসর রীতির মন্দির বিন্ধ্যপর্বত থেকে কৃষ্ণানদীর মধ্যের স্থানগুলিতে পাওয়া যায়। যেমন—বোম্বাই রাজ্যের দক্ষিণ অংশ, এই ধরনের স্থাপত্যকে চালুক্য রীতিও বলে।

নাগর রীতি ঃ

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতির মন্দির, মধ্য ভারতের শিরপুরের লক্ষ্মণ মন্দির, গোয়ালিয়রের পথারি মন্দির এবং নাচনা কুঠারার মহাদেব মন্দির এই নাগর রীতিতে তৈরি। অমর কণ্টকের রাজা কর্ণের তৈরি মন্দিরে একটু বিশেষত্ব এই যে, মূল মন্দির সংলগ্ন একটি 'অন্তরাল' ও একটি মণ্ডপ আছে। এ রকম পর পর তিনটি নিয়েই একটি মন্দির। এ রকম তিনটি নিয়ে

তৈরি আরো মন্দির আছে। রেওয়া রাজ্যে সোহাগ-পুরের বিরাটেশ্বর শিবের মন্দিরে আরও একটি অর্ধ-মণ্ডপ আছে। জয়পুরের বৈরাটের মন্দির খৃষ্টের জন্মের



আবু পাহাড়ের দিলওয়ারার মন্দির

পূর্বে তৃতীয় শতকে তৈরি। চিতোরের নিকট নাগরী মন্দির আরো দু'শ বছর পরের মনে হয়। যোধপুরের

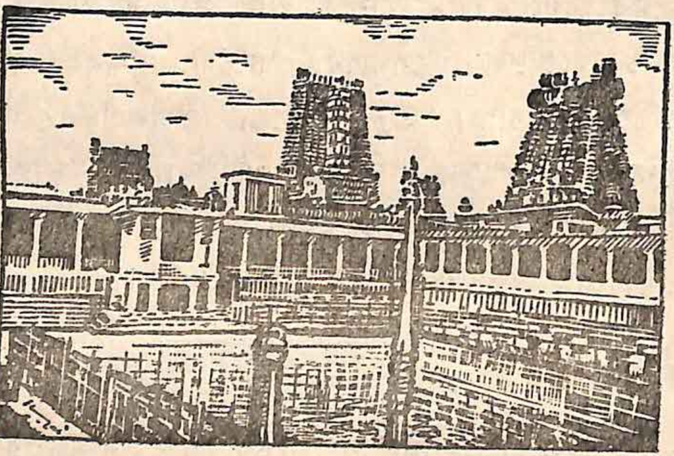
উত্তর পশ্চিমে ওসিয়ায় ব্রাহ্মণ ও জৈনদের অনেকগুলি এই রীতির মন্দির আছে। এগুলি খৃষ্টের জন্মের আটশত বছর পরে তৈরি। যোধপুরের কেকিঙ্গের নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির এবং কিরাডুর সোমেশ্বরের মন্দির, এবং কুম্ভরিয়ার জৈন মন্দিরগুলির স্থাপত্য বিশেষ প্রশংসনীয়। জৈন মন্দিরগুলিতে, বিশেষতঃ নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দিরগুলিতে 'নাগর' রীতির ভিতরেও কিছু বিশেষত্ব আছে। আবু, পালিতানা ও গিরনারে অনেক বিখ্যাত জৈন মন্দির প্রায় সাত শ' বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সেখানের চারটি মন্দিরই শ্বেত-পাথরের তৈরি। ঐ পাহাড়ের উপর দিলওয়ারার মন্দিরকে একজন বিদেশী ঐতিহাসিক ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাজমহল ছাড়া আর কিছুর সংগে এর তুলনা হয় না।

দ্রাবিড় রীতি ঃ

দ্রাবিড় রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় মামল্লপুরমের দ্বিতল ত্রিতল বিশিষ্ট মন্দির ও পাথর কেটে তৈরি রথে। এই রথের মতো দেবালয়কে বিমান বলত। পল্লব সম্রাটদের সময় এই রীতির বিশেষ উন্নতি হয়।

সম্রাট রাজসিংহ পল্লবের সময় তৈরি কাঞ্চীপুরমের

কৈলাসনাথ মন্দির এবং 'বৈকুণ্ঠ পেরুমল' নামের বৈষ্ণব মন্দির এই উন্নত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিচয় দেয়। এ সব খৃষ্টের সাত শ' বছর পরের তৈরি। চালুক্য রাজ্যে পট্টদকলের বিরূপাক্ষ ও বিজয়েশ্বর মন্দির এবং পাশেই ত্রৈলোক্য মহাদেবীর তৈরি ত্রৈলোক্যেশ্বরের মন্দিরগুলি একই দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গৌরবময় প্রমাণ। রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময় ইলোরায় পাহাড় কেটে যে 'কৈলাস' তৈরি হয় তা মন্দির স্থাপত্য ও

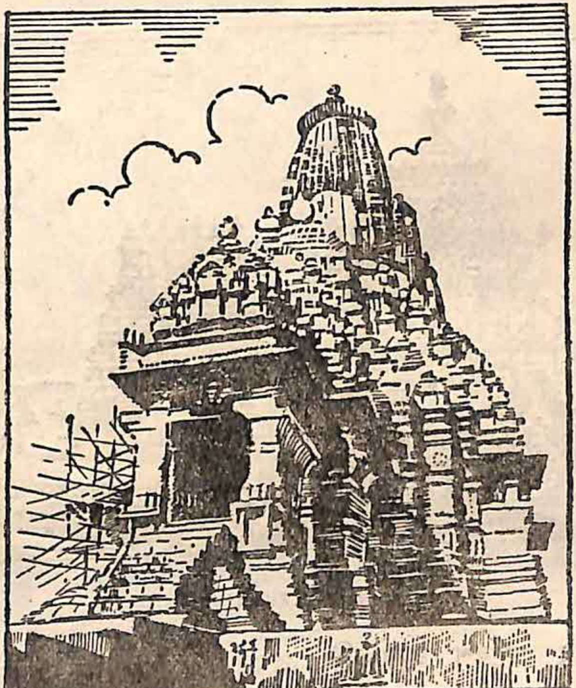


মাদুরায় মীনাক্ষীর মহামন্দিরের ভিতরের দৃশ্য

ভাস্কর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। এর পর চোল রাজাদের সময় নর্তমালায়ের বিজয়ালয় চোলেশ্বর এবং তাঞ্জোর জিলায় ঐরাবতেশ্বর ও ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির চোল

পাণ্ড্য রাজাদের সময়ের দ্রাবিড় স্থপতি ও ভাস্করের গৌরব ঘোষণা করে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত খাজুরাহোর মন্দিরগুলিও মনোরম। এর মধ্যে কাণ্ডারীয় মহাদেব-মন্দির সবচেয়ে



কাণ্ডারীয় মহাদেব-মন্দির

সুন্দর, এটি প্রায় হাজার বছর আগে তৈরি। মাদুরায় মীনাক্ষীর মহামন্দিরের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। প্রায় হাজার বছর আগে পাণ্ড্য রাজাদের

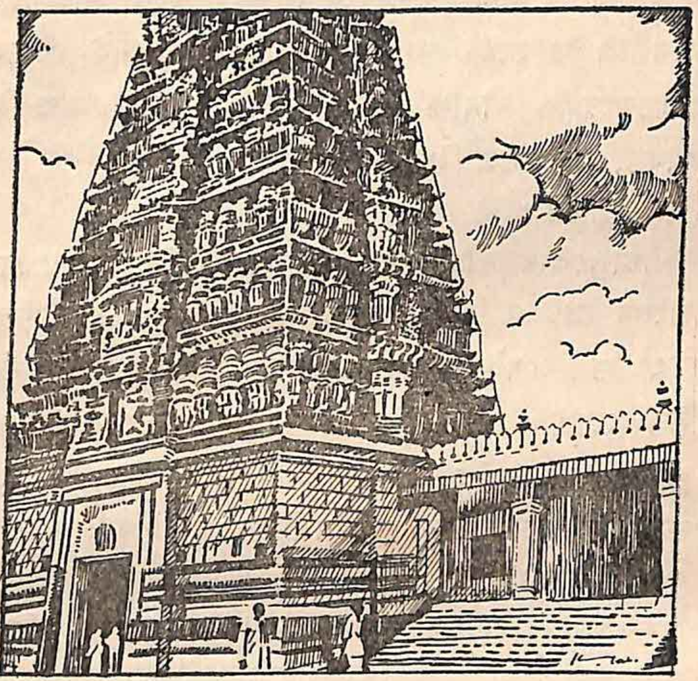
সময় এই মন্দির তৈরি আরম্ভ হয়। সাত শ' বছর ধরে কত শিল্পী একে তৈরি করতে থাকে। মাত্র তিন শ' বছর আগে শেষ হয়েছে নায়েক রাজাদের সময়। স্থাপত্য ভাস্কর্যের এ এক বিরাট নিদর্শন। এর গোপুরম্



রামেশ্বরের মন্দির

অর্থাৎ প্রবেশ দ্বারগুলি প্রকাণ্ড। এগুলি হয়ত তত সুন্দর নয় যত বিশাল। ঐ মন্দিরের পশ্চিম গোপুরমের পাশে 'সঙ্গীত স্তম্ভ শ্রেণী' আছে। নির্মাণ ও স্থাপত্যের আশ্চর্য কৌশলে শূন্যগর্ভ এই স্তম্ভশ্রেণীর প্রতিটি স্তম্ভ সামান্য আঘাতেই একটি বিশুদ্ধ সুরের জন্ম দিতে

সক্ষম। এই মন্দিরের সহস্রস্তম্ভ-দরবারের কথা না বলে পারা যায় না। এতে ন শ' পঞ্চাশটা স্তম্ভ অর্থাৎ থাম আছে। বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে স্তম্ভগুলির



চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের গোপুরম্ (প্রবেশদ্বার)

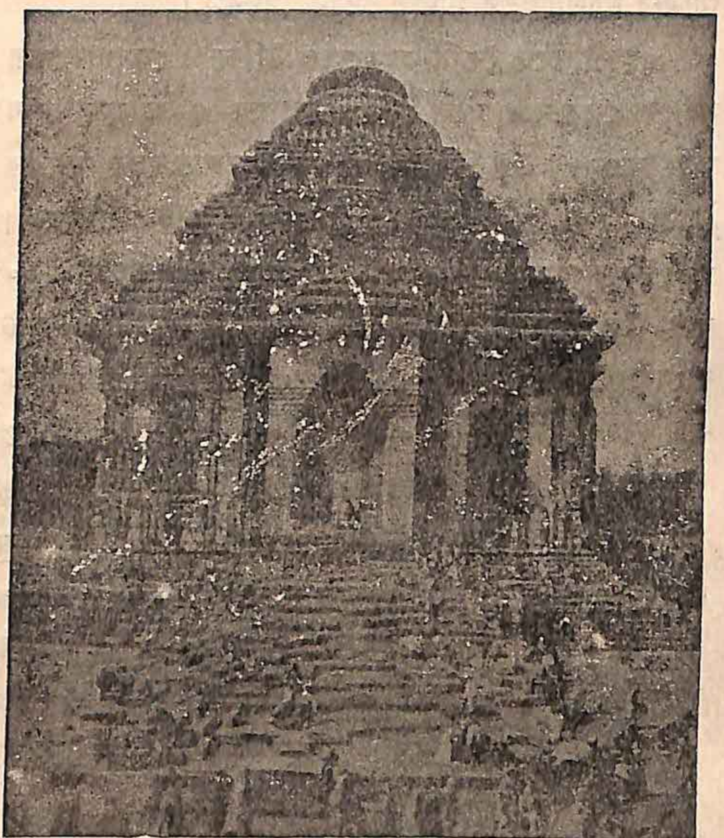
আলাদা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ যেন শিশু বয়সে কাঁচের টুকরো দেওয়া সেই খেলা, যাতে চোখ রেখে আলোয় ধরে ঘোরালে প্রতিবারই হাজির হত

অজস্র নূতন নূতন নমুনা! একটি সোনার ও একটি রূপার ঘোড়া আছে। শিল্পীর এমন বাহাদুরী যে, দেখলে মনে হবে যেন ঘোড়াগুলি স্থির নয়, ছুটছে। আর সুন্দরের মন্দিরের সামনে নিকষ কালো পাথরের থামগুলি ভাস্কর্যের অতুলনীয় কৃতিত্ব। সেই থামে সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীর বিবাহ দৃশ্য কি মনোরম ও কি জীবন্ত, না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

বেসর রীতি ঃ

চালুক্যের রাজাদের সময় এই রীতির স্থাপত্যের বিশেষ প্রচলন হয়। দ্রাবিড় রীতি থেকে এই রীতির উৎপত্তি। সেই কারণে দাক্ষিণাত্যের অর্থাৎ কৃষ্ণানদীর উত্তরাংশেই এ রীতির স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই রীতিতে তৈরি মন্দিরে দ্রাবিড় রীতির মন্দিরের মতো দুটি প্রধান অংশ থাকে। তাদের বলে বিমান মণ্ডপ।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে কুকেকানরে কল্লেশ্বরের মন্দির, ধারওয়ার জেলায় লুক্কুণ্ডি অর্থাৎ লোক্কিকুণ্ডির জৈন-মন্দির মোটামুটি এই রীতিতে তৈরি। চৌদ্দদামপুরের মুক্তেশ্বর মন্দির এবং হাবেরীর সিদ্ধেশ্বর মন্দির, হর-লহল্লীর সোমেশ্বর মন্দির প্রায় সাত শ' বছর আগের তৈরি। লুক্কুণ্ডির কাশী বিশ্বেশ্বর এবং ইত্যাগীর মহাদেব



কোনারকের সূর্য-মন্দির

লাভ করেছে। এই চালুক্য রীতির চরম উৎকর্ষ দেখা যায় দ্বার-সমুদ্রের হয়শলা রাজাদের সময় মহীশূর

রাজ্যে। ডম্বলের দোদ্দাবাসপপ্পা মন্দির এবং হেলবিন্দের হয়শালেশ্বর মন্দির ইহার নিদর্শন।

এই রীতিতে তৈরি না হলেও উড়িষ্যার কোণারকের সূর্য দেউলের কথা বলে মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শেষ করা হচ্ছে। এই বিখ্যাত মন্দির সাতশত বছর আগের তৈরি। পুরীর থেকে বেশ কয়েক মাইল উত্তরে। পুরী বা ভুবনেশ্বর থেকে যাওয়া যায়। মন্দিরটি ২৩০ ফুট উঁচু ছিল। কিন্তু উপরের অংশ প্রায় ১০০ ফুট ধ্বংস হয়ে গেছে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণই এর কারণ মনে হয়। বার শ' শিল্পী ষোল বছর ধরে এই দেউল তৈরি করেছিল। এই মন্দির তৈরি করতে ৩৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং দশ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি লাগান হয়েছে। ইউরোপ এর অনেক পরে এ রকম জিনিস তৈরি করতে পেরেছে। এই মন্দিরের পাশে একটি গজ-সিংহমূর্তি পড়ে আছে। তার ওজন তের শত মণ। ভেঙে পড়বার আগে এক শ' সত্তর ফুট উঁচুতে মন্দিরের গায়ে এটি লাগান ছিল।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে আছে প্রায় একশ'টি মন্দির। সেই সব মন্দিরের গায়ে আঁকা নর-নারীর মূর্তিগুলি লাবণ্য-বিলাসে চির উজ্জ্বল। উড়িষ্যায় আরও ভাস্কর্য-শিল্প আছে যা ভারতকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে।



ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন

মন্দিরের উপকারিতা ঃ

এই মন্দির তৈরি শিল্পের দরকার বুঝতে পারি যখন আমরা জানতে পারি যে, এগুলি শুধু ধর্মশিক্ষার স্থান ছিল না, জগতের অন্য নানান রকমের শিক্ষাও এখানে দেওয়া হোত। মন্দিরগুলি শুধু দেবমন্দির ছিল না, বিদ্যামন্দিরও ছিল। ভোজরাজের ধারা নগরীর কথা অনেক শোনা যায়। সেখানে সরস্বতী মন্দিরে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ছিল। পূর্বে যে খাজুরাহো মন্দিরের কথা বলা হয়েছে তাতে প্রবেশ করার পথে অনেক বড় বড় ঘর আছে। তার কোনটিতে সভা বসত, কোনটিতে অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ ছিল এবং কোনটিতে সংগীত শিক্ষা দেওয়া হোত। সেকালে ধর্মাচরণের সংগে শিক্ষা এবং নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ একসংগে মন্দিরেই সম্ভব হয়েছিল। আজও ভারতবর্ষের লোক মূলতঃ যে ধর্মপ্রাণ রয়েছে তার একমাত্র কারণ হোল—সেকালে মন্দিরগুলি শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, মানুষের দৈনিক জীবনের ভিত্তিতে গড়ে উঠত এবং পরিচালিত হোত।

বাংলার শিল্পকথা ঃ

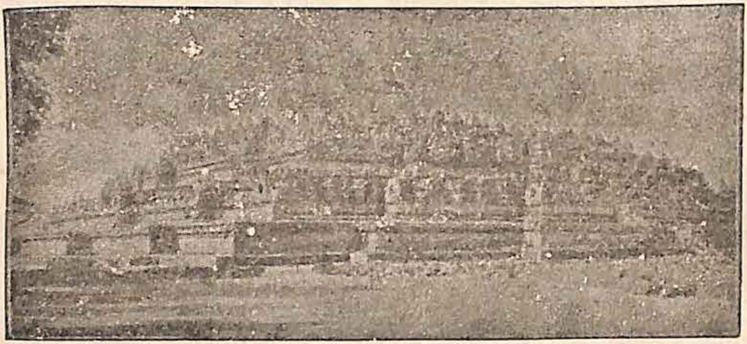
ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে সকল নমুনা উপরে দেওয়া হয়েছে তাতে বাংলার কথা নেই। কিন্তু

বাংলার পাল রাজাদের সময় শিল্পকলার বেশ উন্নতি হয়েছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর শিল্পের জন্য সারা ভারতে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে হিন্দু-বৌদ্ধ ধাতু ও পাথরে তৈরি মূর্তি এই পাল রাজাদের সময় শিল্পকলা ও পরিপাট্য ও পরিকল্পনার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট মনোহারী—ভারতের অন্য স্থানে শিল্প নিদর্শন আছে, তবে শিল্পীদের নাম লোপ পেয়ে গেছে; কিন্তু পাল যুগের ধীমান ও বীতপালের নাম এখনো মনে আছে। পাহাড়পুরে যে সকল আবিষ্কার হয়েছে তাতে জানা গেছে যে পালযুগের অনেক আগেই বাংলায় শিল্পকলা অনেক উন্নত ছিল, ঠিক গুপ্তযুগের শিল্পের মতো।

এশিয়ার উপর প্রভাব ঃ

শেষে আর একটি কথা বলা দরকার। ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারত ছাড়িয়ে বৃহত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অজন্তা ও নাসিকের গুহার ভাস্কর্য ও সৌন্দর্য যবদ্বীপেও দেখতে পাওয়া যায়। বরবুদুরের মন্দির জগতের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য জিনিস। সেখানে ভাস্কররা হাজার বছর আগে যা কিছু ক'রে রেখে গেছেন, তাকে পর পর সাজিয়ে গেলে তিন মাইল

লম্বা হবে। সিংহল, আনাম, কম্বোডিয়া ও বালী দ্বীপের শিল্পকলার উপরও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। শুধু বৃহত্তর ভারত কেন, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়ার শিল্প এই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত।



বরবুদুরের মন্দির

ধর্মে প্রাচীন কালে এশিয়া যেমন ভারতবর্ষকে গুরু করেছিল, শিল্পতেও সেকথা বলা চলে।

মুসলমান ও মধ্যযুগ ঃ

মুসলমান যুগেও শিল্পকলার আদর ও উন্নতি বড় কম ছিল না। ভারত বিজয় ও তার পরে সাম্রাজ্য গঠনের কবলে ব্যস্ত থাকলেও পাঠান সুলতানরা শিল্পের দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতের বাহির থেকে আমদানী অথবা হিন্দু ও মুসলমান পদ্ধতি মিশে তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে

দুরকম মত আছে। তবে বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের মত—পাঠান সুলতানদের সময়ে মুসলমান শিল্পকলার উপর প্রাচীন হিন্দু শিল্পকলার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুলতানরা যে অনেক হিন্দু স্থপতি ও ভাস্কর নিযুক্ত করেছিলেন, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ সময়ের স্থাপত্যের নিদর্শন দিল্লীর কুতুবমিনার ও কুতুবমিনারের আলাইদরওয়াজা, অতাল মসজিদ প্রভৃতি। বাংলাদেশেও সে সময়ে ইট ও পাথর মিশিয়ে একপ্রকার শিল্প রীতি গড়ে উঠেছিল। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, হুসেন শাহের আমলে তৈরি ছোট সোনা মসজিদ, নুসরৎ শাহের আমলে তৈরি বড় সোনা মসজিদ, সুলতানী যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলাদেশের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন। হিন্দু স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে পদ্ম প্রভৃতি যে সব অলংকার কারুকার্য ছিল, অনেক মসজিদেও সে সবের ব্যবহার দেখা যায়। গুজরাট, জৌনপুর, মালব প্রভৃতি দেশে ঐ সময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। গুলবর্গার জামি মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার প্রভৃতি এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু বিজয়নগর, উড়িষ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চলন সুলতানরা বন্ধ করতে পারেন নি। মন্দির ভেঙ্গে হয়ত মসজিদ গড়া হয়েছিল,

কিন্তু যে মন্দির এখনও মাথা তুলে আছে তা হিন্দু রীতিতেই তৈরি। যেমন পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোনারকের সূর্য-মন্দির, বিজয়নগরের "হাজার মন্দির" এবং "বিঠলদেবের মন্দির"।

মোগল আমল ঃ

তুর্কী-আফগান সুলতানদের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের সূচনা হয়েছিল, মোগল বাদশাহ আকবরের আমলে তা অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল। শাহজাহান ও ঔরংজেবের আমলেও এই সম্প্রীতি একেবারে নষ্ট করতে পারে নি। হিন্দু মুসলমান দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে শিল্পকলা ও সাহিত্যের মধ্যে যে নূতন চেতনা জেগে উঠেছিল, তার ফল ফলে ছিল সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে।

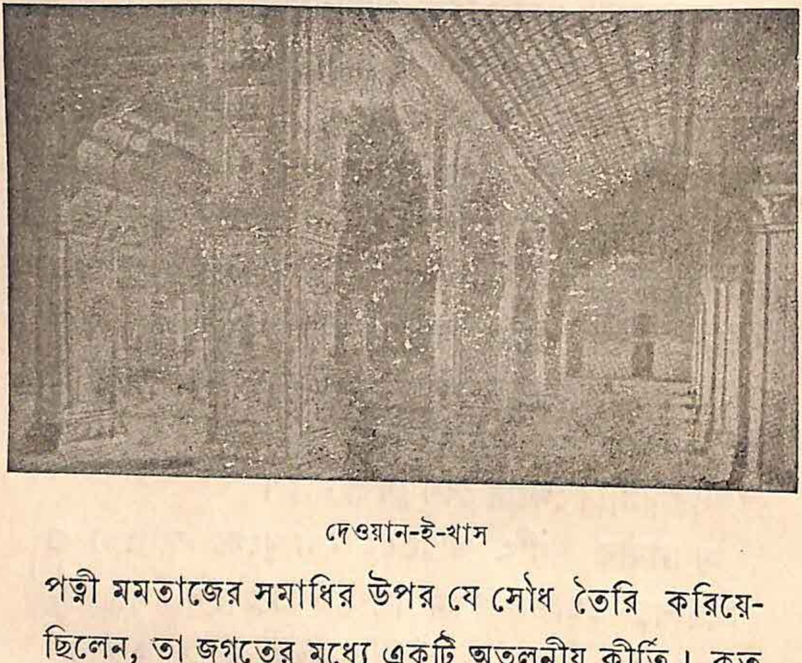
সাহিত্যের মতো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মোগল বাদশারা। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর ভারতের শিল্প-রীতি পছন্দ না করলেও তিনি অসংখ্য ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্কর নিযুক্ত করেছিলেন। হুমায়ূনের আমলে দুটি সুন্দর মসজিদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শের শাহের সহায়তায়

তৈরি ‘পুরাণ কিলা’, ‘কিলাই কুহনা মসজিদ’ এবং তাঁর সমাধিসৌধ প্রভৃতি উন্নত ও আলংকারিক শিল্প রীতির নিদর্শন।

আকবরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রণে তৈরি প্রাসাদ দুর্গ, মসজিদ ও সমাধি সৌধগুলির মধ্যে ফতেপুর-সিক্রি, জাহাঙ্গীরি মহল, হুমায়ূনের সমাধি, ইবাদতখানা, পাঁচমহল, বুলন্দ দরওয়াজা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। আকবরের মৃত্যুর পর সেকেন্দ্রায় যে সমাধি-সৌধ তৈরি হয়েছিল তার পরিকল্পনা তাঁর জীবিত অবস্থায় ঠিক হয়েছিল। তাঁর জীবিত ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় রাজপুত-শিল্প রীতির সংগে মুসলমানী রীতির সংমিশ্রণ ইতিমাদ্-উদ্-দৌলার সমাধি ক্ষেত্রে বেশ দেখা যায়।

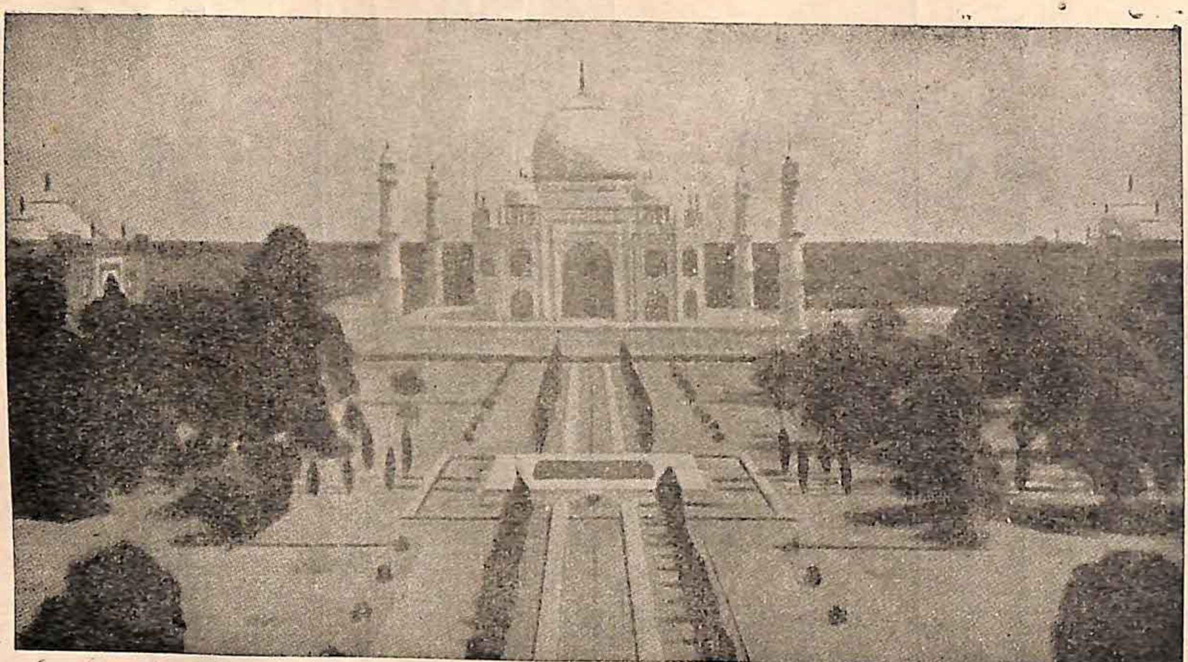
মুসলমান অর্থাৎ ভারতের মধ্য যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে। মৌলিক অর্থাৎ কারো অনুকরণ না ক’রে আকবরের সময়ে যে শিল্প কৌশল দেখা দিয়েছিল, শাহজাহানের সময়ে সেরূপ মৌলিক শিল্প-কলা দেখা যায় নি সত্য; কিন্তু আলংকারিক শিল্প কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে শাহজাহানের সময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সত্যই অনেক উৎকৃষ্ট স্বীকার

করতে হবে। তাঁর 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জামি মসজিদ', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রায় যমুনার তীরে তিনি তাঁর প্রিয়তমা



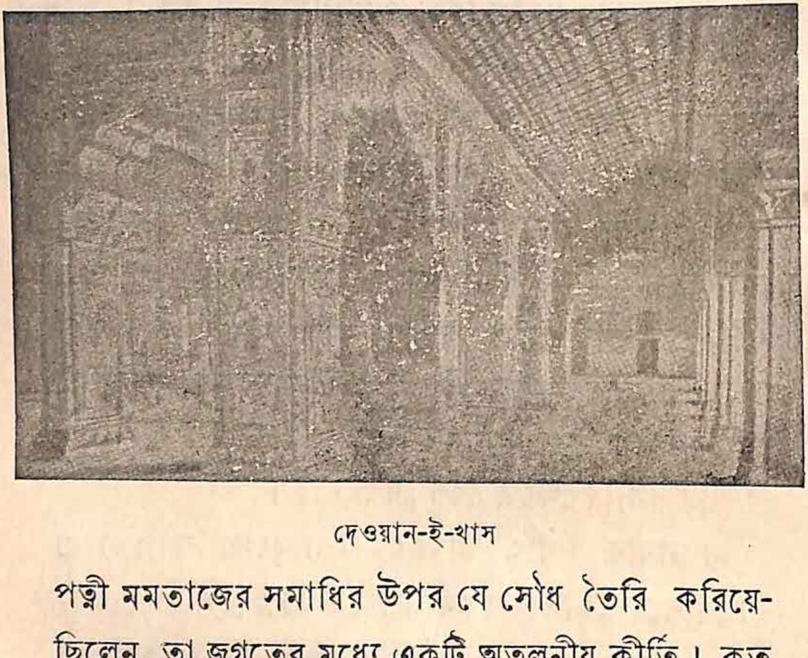
দেওয়ান-ই-খাস

পত্নী মমতাজের সমাধির উপর যে সৌধ তৈরি করিয়েছিলেন, তা জগতের মধ্যে একটি অতুলনীয় কীর্তি। কত শিল্পী যে কুড়ি বছর ধরে এটি তৈরি করেছিলেন এবং এতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল তা কে জানে? চাঁদের আলোতে এই তাজের মনোরম দৃশ্য না দেখলে বর্ণনা করে বুঝানো কঠিন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সংগে শিল্পীর প্রতি অনুরাগ কমে গিয়েছিল। কেবল



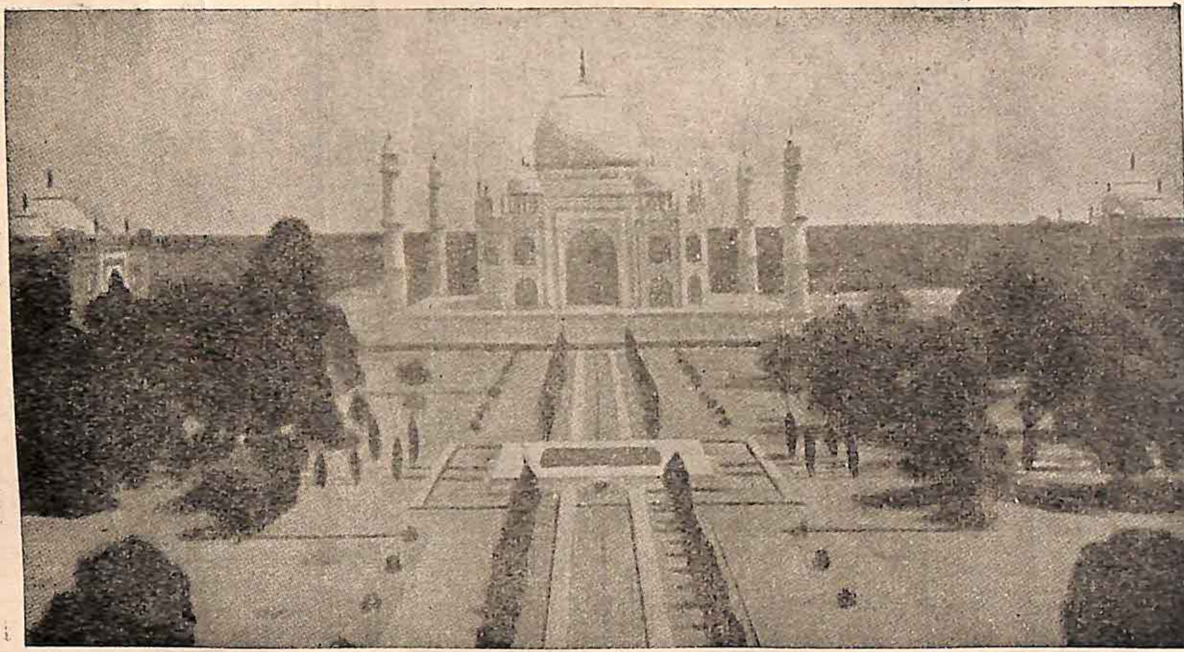
তাজমহল

করতে হবে। তাঁর 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জামি মসজিদ', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রায় যমুনার তীরে তিনি তাঁর প্রিয়তমা



দেওয়ান-ই-খাস

পত্নী মমতাজের সমাধির উপর যে সৌধ তৈরি করিয়েছিলেন, তা জগতের মধ্যে একটি অতুলনীয় কীর্তি। কত শিল্পী যে কুড়ি বছর ধরে এটি তৈরি করেছিলেন এবং এতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল তা কে জানে? চাঁদের আলোতে এই তাজের মনোরম দৃশ্য না দেখলে বর্ণনা করে বুঝানো কঠিন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সংগে শিল্পীর প্রতি অনুরাগ কমে গিয়েছিল। কেবল

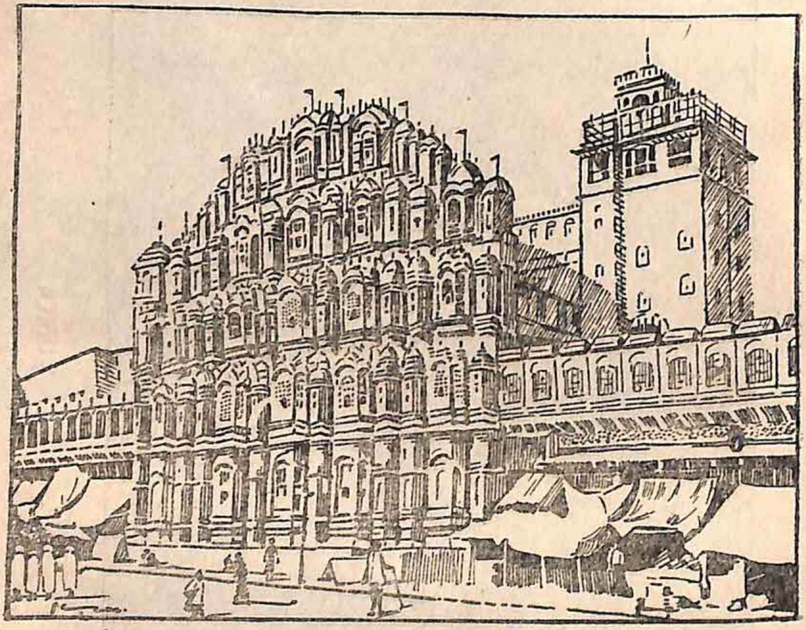


তাজমহল

অযোধ্যায়, রাজপুতনায় ও হায়দরাবাদে শিল্প-চর্চা অনেক দিন চলেছিল।

জয়পুরের হাওয়ামহল ঃ

মোগলদের পতনের পরে ইংরাজদের অভ্যুদয়ের সময় এই জয়পুর সহরের মাঝখানে একটি মনোরম সৌধ



জয়পুরের হাওয়ামহল

তৈরি হয়। এরি নাম 'হাওয়ামহল'। এর স্থাপত্য কৌশলের জন্যই এটি বিখ্যাত। এর নির্মাতার নাম সওয়াই প্রতাপ সিং। এই গৃহের স্থাপত্য বিচিত্র।

এমনটি ভারতের আর কোথাও নেই। বাড়িটি পাঁচতলা, প্রত্যেক তলা জালির কাজ সমেত অর্ধ অষ্ট কোণাকৃতি। এই পাঁচতলা নিরাপদে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র ৮ ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের উপর। জয়পুরের রাজা মানসিংহ বাংলার যশোহর থেকে যে সকল শিল্পী নিয়ে গিয়েছিলেন, এ সৌধের স্থাপত্যে তাঁদের অংশ আছে। বাংলার শিল্পরীতি রাজস্থানের শিল্পরীতির উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই সৌধটি তার প্রমাণ। মহলের আকারটি ঠিক বাংলার প্রতিমার চাল-চিত্রের মতো। জানালাগুলি দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা ভাস্কর্য মূর্তির মতো। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে, এত পাতলা দেওয়ালের উপর বাড়িটি যেন হাওয়ায় ভাসছে। তাই এর নাম হাওয়ামহল। রাজপুতানার শিল্প প্রসঙ্গে চিতোরগড় দুর্গের উপরিভাগের মন্দির এবং প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের উদ্দেশ্যে তৈরি কীর্তি-স্তম্ভ উল্লেখযোগ্য।

একালের ভাস্কর্য ঃ

আধুনিক যুগে ধর্মের প্রেরণাও নেই, রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতাও নেই। ভাস্কররা এখন একক। কি আদর্শ নিলে ধর্মে আস্থাহীন সমাজের উপযোগী হবে একদিকে সে ভাবনা, অপর দিকে সহায়

সম্বল সব নিজেকেই যোগাড় করতে হবে, পিছনে কেউ নেই। বর্তমানে বাংলাতেই প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর কিছু পাওয়া যায়; যেমন—প্রদোষ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, শঙ্খ চৌধুরী, চিন্তামণি কর, সুনীল পাল, রামকিঙ্কর প্রভৃতি।

এই শিল্পের ভবিষ্যৎ :

আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। আমরা যদি বিদেশী নিকৃষ্ট শিল্পের মোহে নিজেদের প্রাচীন শিল্প গৌরবের কথা ভুলে যাই এবং তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করি, আমাদের উন্নতি, সুখ সমৃদ্ধির আশা বৃথা সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি চারুশিল্পের একাডেমি বা কাউন্সিল আদি রাজ্যে রাজ্যে স্থাপন করে চারুকলাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একত্র আলোচনা :

আজকাল স্থাপত্যবিহীন ভাস্কর্যের যুগ। কিন্তু পূর্বে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক ছিল। ভাস্কর্যের বিকাশ হয়েছিল স্থাপত্যকলাকে কেন্দ্র করে। স্থাপত্যকে বাদ দিয়ে ভাস্কর্যের কথা ভাবাই যেত না। তাই এ দুটির আলোচনা এক সংগে করা হোল।



ভারতের চিত্রকলা



"আমাদেরি কোনও সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদেরই পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবিগুরুর ছবি আঁকা :

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছর বয়সে কবিতা লিখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কাটাকুটি হচ্ছে। নতুন চরণ বসানোর আগে তাঁর মনে খেলছে কবিতার সুর ও ছন্দ রচনা। আবার লিখতে সুরু করে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তাঁর হিজিবিজি কাটাকুটির একটা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। এইখানেই খুলে গেল একটা অজানা লোকের দরজা। সজাগ-ভাবে শুরু করলেন তিনি ছবি আঁকা এবং জীবনের বাকী দশ বছরে প্রায় দেড় হাজার ছবি এঁকে ফেললেন। চিত্রকর হিসেবে তাঁর খ্যাতি, কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতির অনেক নীচেই ছিল, কিন্তু এ বোঝা যায়, ছবি আঁকাটা কত সহজেই সুরু করা যায়। কারণ কতকগুলি রেখার সমাবেশ হলে ছবি তৈরি হয়ে যায়। তবে এ সমাবেশটা সুষ্ঠু সুন্দর এবং চিত্রবিদ্যার উপদেশ মতো হওয়ার উপর ছবির উৎকর্ষ নির্ভর করে।

ছবি আঁকা ও তার বিদ্যা :

কি করে আঁকলে ভাল ছবি হবে, এ বিদ্যা না থাকলেও মানুষ ছবি আঁকতে পারে। তাই একবারে আদিম যুগে গুহাবাসী মানুষ তার গুহা-ঘরে পাথর বা

আর কিছু দিয়ে পাথর বা হাড় বা সিং-এর উপর হরিণ, সিংহ বা অন্য প্রিয় জন্তুর ছবি আঁকত। ইউরোপে স্পেন দেশে এবং তার নিকটে দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে এ রকম আঁকা ছবি দেখা যায়। তার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয় ভারতের রায়গড় ও মীর্জাপুরের গুহাগুলির আঁকা ছবি। সুরগুজারাজ্যে রায়গড় পাহাড়ে সীতা বেংগা ও যোগীমারা গুহায় আদিম যুগের হাঁসগুলিও এই শ্রেণীর। অবশ্য এ সব অঙ্কনের সংগে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক চিত্রকলার যোগ সূত্র না থাকাই সম্ভব। কারণ, এই সব আঁকা খৃষ্টের জন্মের দু'শত বৎসর আগে।

দেওয়াল অঙ্কন ঃ

এরূপ দেওয়ালে আঁকা সুন্দর ছবি আমাদের দেশে আবিষ্কার হয়েছে। শুধু দক্ষিণ ভারতের অজন্তা ও ইলোরায় নয়, বাগসিগিরিয়া সিওননবশল, কাঞ্জিবরম, তাঞ্জোর, তীরুবল্লিপুরম্ এবং তীরুমালাইপুরমের গুহায় যে সকল দেওয়াল চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার নৈপুণ্য জগতে বিরল। বদমী গুহার চিত্রকলা মাত্র কয়েক বছর আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সব তৈরি হয়েছিল ভারতীয় চিত্রকলার স্বর্ণ যুগে।

বৌদ্ধ ও হিন্দু চিত্র-শিল্পী ঃ

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য, এই দুই যুগেই চিত্রকলার সৌন্দর্যের কথা জানা যায়। মহাভারতের রাজকুমারী



ইলোরার ভিত্তিচিত্র (লক্ষ্মীনারায়ণ)

ঊষার চিত্র-বিদ্যায় নিপুণা চিত্রলেখা নামে এক সখীর কথা আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পিটক হতেও জানা

যায় যে, আম্রপালী নানা দেশ থেকে চিত্রকর আনিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল দেওয়ালের উপর তাঁদের দেখা রাজা ও বণিকদের ছবি আঁকা। শোনা যায়, সম্রাট বিম্বিসার সেই রকম এক ছবি দেখে তাঁকেই ভালবেসে ফেলেছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের বিলাস ভবনে চিত্রাগারের কথাও এই গ্রন্থে আছে।

তিন রকম ছবি ঃ

সেই সময়কার তিন রকম চিত্রের কথা জানা যায়। লেপ্যচিত্র, লেখ্যচিত্র, ধূলিচিত্র। লেপ্যচিত্র তুলি



অজন্তাগুহার দেওয়ালচিত্র

ও রং দিয়ে আজকালের পটচিত্রের মতো কাপড়ের উপর আঁকা হোত। তাতে নানা রকমের কাহিনী ছবিতে

ফুটিয়ে তোলা হোত। লেখ্যচিত্র কতকটা আজকালের আল্পনার মতো। আর ধূলিচিত্র সাদা বা রং দেওয়া চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ছবি, অনেকটা আল্পনারই মতো।

প্রাচীনযুগে চিত্রবিদ্যার স্থান ঃ

প্রাচীন সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে চিত্রবিদ্যার কত আদর ছিল এবং তা যে রাজা, প্রজা, বড়, ছোট সকল রকম লোকের প্রিয় ও শিক্ষণীয় ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। রামায়ণে চিত্রশিল্পকে 'বৈহারিক শিল্প' বলা হয়েছে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' গ্রন্থে নানাশিল্প মধ্যে চিত্রশিল্পকে অনেক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং অন্য শিল্পকে এর আনুসংগিকভাবে শিখতে বলা হয়েছে। বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেখা যায় রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়কে চৌষট্টিকলার মধ্যে চিত্রকলাও শিখতে হয়েছিল। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্মন্তের ছবি আঁকার কথা এবং এই ছবি আঁকা যে একটি 'বিনোদস্থান' অর্থাৎ আরামে সময় কাটাবার জিনিস, একথা জানা যায়।

গুহাচিত্র ঃ

একটু আগে অজন্তা প্রভৃতি যে গুহাচিত্রের কথা বলা হয়েছে, তার বর্ণনা শুনলেই আমাদের দেশে যে

সকল প্রবীণ শিল্পী সেগুলি এঁকেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা এমনি নত হয়ে আসবে। অজন্তার গুহাগুলি



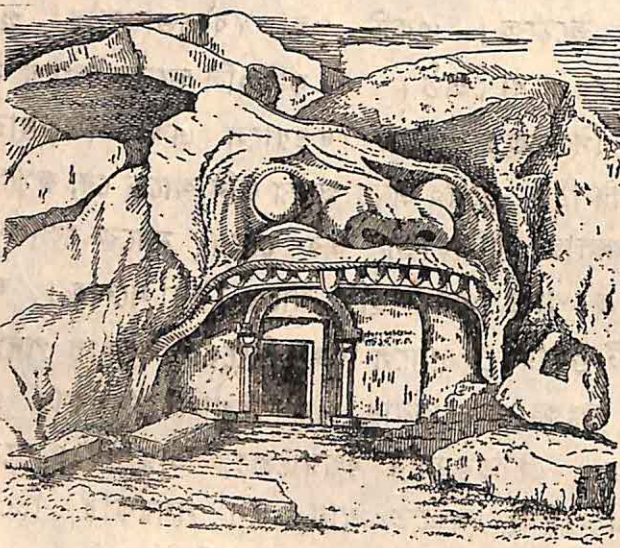
অজন্তাগুহার আরও একটি দেওয়ালচিত্র

গাঢ় অন্ধকারে ভরা। এই সকল নিখুঁত চিত্র কিভাবে ওই অন্ধকারের মধ্যে শিল্পীরা এঁকেছিলেন, তা পণ্ডিতেরা

আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। একজন বিদেশী রসজ্ঞ লিখেছেন যে, এক একটি ছবিতে চোখের হাসি থেকে অঙ্গুলি সঞ্চালন পর্যন্ত সবই সজীব ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একটি গুহা বৌদ্ধভারতের গুহা-মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর ছবিগুলি অনেক অংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটি দেওয়ালে এক রাজকুমারীর মরণের ঠিক পূর্বের এমন সুন্দর ছবি আছে যে, জগতের শিল্পকলার ইতিহাসে এর চেয়ে মনকে অভিভূত করতে পারে এমন ছবি আছে কিনা সন্দেহ। আর একটি গুহার দেওয়ালে বিজয় সিংহের লংকায় পদার্পণ এবং লংকা জয় করার এক বিশাল চমৎকার ছবি আছে। গৌতম যখন বুদ্ধত্ব পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সংগে দেখা করতে যান, সে সময়কার চিত্রের একদিকে প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ ও অন্যদিকে গভীর প্রেমের যে মহিমা ফুটে উঠেছে, যে কোন জাতি সে ছবিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গৌরব করতে পারে। গৌতম ও যশোধরা এবং মারের প্রলোভনের সামনে বুদ্ধ—এ দুটি ছবিও খুবই উঁচু দরের সন্দেহ নেই। এই সব চিত্র আজও বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা আগেই উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কথা জেনেছি। এই শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আছে দুটি

পাহাড়—খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। এখানে আছে অনেক জৈনগুহা—রাণীগুম্ফা ও বাঘ গুহা হল খুব নামকরা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বাঘের মতো মুখ বের



জৈনগুহার শিল্পচাতুর্য (উদয়গিরির বাঘগুহা)

করে আছে। এগুলিকে জৈন-শিল্পের সব থেকে সুন্দর নিদর্শন বলা যায়। এগুলিকে উড়িষ্যার গুহাশিল্প চাতুর্যের অন্যতম।

শিল্পীদের যত্ন ঃ

এই সব নির্জন গুহায় বহুদিন ধরে যে সব শিল্পী ছবি আঁকার কাজে একেবারে ডুবেছিলেন, তাঁদের মন ভাল রাখবার জন্যে সেকালের রাজারা

কত না সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন। শীতকালে সেখানে মেলা বসাতেন। নাচ-গানের আনন্দে খুসী-ভরা লোকজনের সংগে মিলে মিশে থেকে শিল্পীদের আনন্দ বজায় থাকত। যে শিল্পীরা দেশের গৌরব প্রচার করেন, তাঁদের প্রতি এ রকম আদর-যত্ন করা উচিত।

ধর্ম ও বাস্তবজীবন ঃ

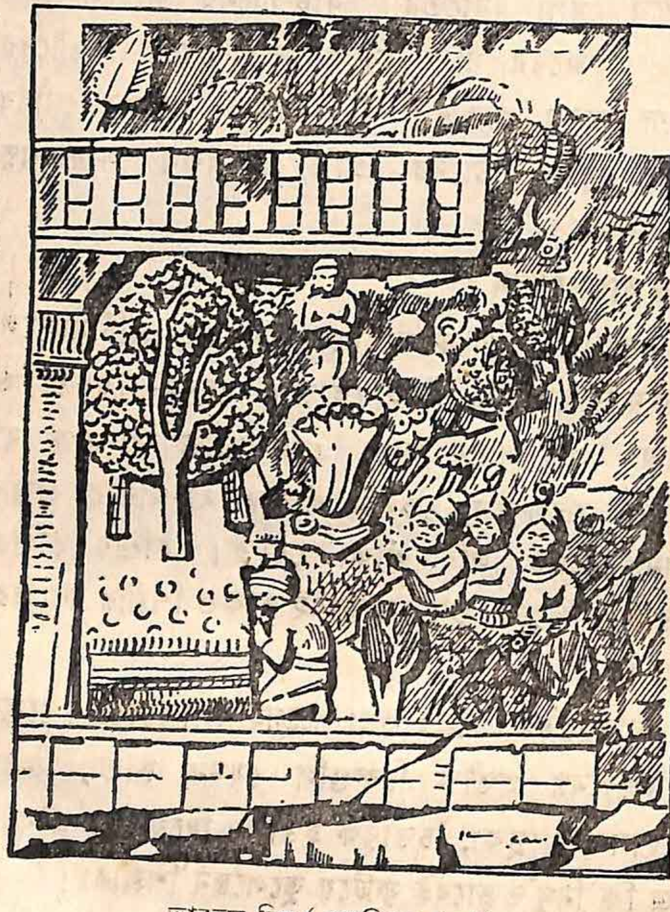
এসব শিল্পীদের কাজ দেখে মনে হয়, প্রাচীনকালে দু'রকম বিষয়ে ছবি আঁকা হোত। যেমন—দেবতা ও ধর্মের সংগে সম্বন্ধ আছে এমন ব্যক্তি বা জন্তু বা কাহিনী অবলম্বনে, তেমনি আবার নর-নারীর বাস্তব জীবন নিয়েও ছবি আঁকা হোত। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দু'রকম ভাবই থাকত শিল্পীর কাজের মধ্যে।

ভারহুতের শিল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। বুদ্ধের মহাজীবনের প্রতীক চিহ্নগুলি যেমন, ছাতা, ত্রিরত্ন সিংহাসন, পাদুকা, চৈত্যবৃক্ষ ইত্যাদি দিয়ে তাঁর জীবনী-চিত্র কি নিখুঁতভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা!

ছন্দ ও রস ঃ

চিত্র কথাটা এসেছে 'চি' ধাতু থেকে, যার মানে চয়ন করা। মালাকার যেমন পুষ্প চয়ন করেন, তেমনি

চিত্রশিল্পীও চয়ন করেন কত কি—শুধু বাইরের দৃশ্য-



ভারহুত চিত্র (বোধিবৃক্ষ-পূজা)

জগৎ নয়, অন্তরের অনুভূতির জগৎও ; ঐ দুয়ের 'ভাব' চয়ন করেন ; তার সংগে রূপ, লাবণ্য, প্রমাণ,

সাদৃশ্য, বর্ণিকাভংগ সবই চয়ন করেন। শাস্ত্রকারেরা ছবির এই ছ'টি অংগ বলে গেছেন। একেই বলে চিত্রের 'ষড়ংগ'। কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করে সাজি ভরতে পারে, বাগান সাজানো যেতে পারে না। তেমনি কতকগুলি কথা জড় ক'রে অভিধান তৈরি হতে পারে। কিন্তু তাতে আদর্শ চিত্র হবে না। আদর্শ চিত্র হবে তখনি, যখন চিত্র রূপ, লাবণ্য, ভাব ইত্যাদি চয়ন করার সংগে চিত্রকরের চিত্র অন্যের চিত্ত হরণ করতে পারবে। শুধু অপরের চিত্ত বা মন বা প্রাণ নয়, নিজের প্রাণও আনন্দে ভরে যাবে ছবি এঁকে।

এই প্রাণ মাতানো কিসে সম্ভব? যদি ছবির মধ্যে ছন্দ এবং রস আনতে পারা যায়। এই ছন্দ হোল শ্রী। এই শ্রী না থাকলে শুধু ছবি নয়, কোন জিনিসই ভাল লাগে না। যদি কোন বাড়িতে এই ছন্দ বা শ্রী না থাকে, আমরা চলতি কথায় বলি—'ঘরের ছিরি ছাঁদ' (শ্রী-ছন্দ) নেই। এই ছন্দ বা শ্রীকে বাঁধতে হবে। তাই বিয়ের সময় 'ছাঁদনীতলা'য় ছাঁদ (ছন্দ) বাঁধতে হয়, মেয়েদের লক্ষ্য হচ্ছে কি করে একেবারে অজানা অচেনা কুমার-কুমারী বর-কনের মাঝে ছন্দ বা মিল বা মিলন করা যায়। এই ছন্দ এসে গেলেই রস এসে যাবে। রসই হোল ছবির সবটুকু, প্রাণের

প্রাণ। চোখ খুসী হলে হবে না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় খুসী হলে হবে না, 'চোখে দেখে গাঁয়ে ঠেকে ধূলো আর মাটি'। খাঁটি রস চাখতে হলে এ রসনায় চলবে না, চাই প্রাণ-রসনা।

ষড়ংগ :

ভাল ছবি তৈরি করতে গেলে যে ছ'টি অংগ ঠিক মতো চাই তা আগে বলা হলেও তার ঠিক ঠিক মানে বোঝা চাই। প্রথমটি হচ্ছে রূপভেদ, এখানে 'ভেদ' মানে 'বিভিন্নতা' নয়। প্রকৃতির রূপের 'রহস্য বা মর্ম ভেদ করা অর্থাৎ জানা'। রূপ ঠিক করতে গেলেই 'প্রমাণ' বা ঠিক মতো ধারণা ও মাপ করে আকৃতি স্থির করা দরকার হয়ে পড়ে। কতটা নিকট, কতটা দূর, লম্বা কত, চওড়া কত এ সবের মান পরিমাণই হল প্রমাণ, ছবির দ্বিতীয় অংগ। এ দুটি ঠিক হয়ে গেলেই 'ভাব'-এর উদয় এবং 'লাবণ্য'-এর সঞ্চার হবে। এ দুটি তৃতীয় ও চতুর্থ অংগ। তারপর পঞ্চম অংগ 'সাদৃশ্য' অর্থাৎ কোন এক রূপের ভাব অন্য কোন রূপের সাহায্যে আমাদের মনে জাগিয়ে দেওয়া; এবং শেষে 'বর্ণিকাভংগ' অর্থাৎ বর্ণিকা বা তুলি দিয়ে নানা রং ফলিয়ে ছবির শেষটুকু অর্থাৎ প্রাণের সঞ্চার করা। এই দু'টির পিছনে আছে কিন্তু

সেই ছন্দ, যা ছবিকে নির্জীব না করে সজীব করে তুলবে।

তাল ও মান :

ছবি আঁকতে গেলে তাল ও মান এই দুটির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গানেও এ দুটি ঠিক করে চলতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পকারেরা মূর্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। নর, ক্রূর, আসুর, বালা এবং কুমার।

এই পাঁচ রকমের জন্য পাঁচ রকম তাল ও মান ঠিক করে দিয়েছেন। তাল কি ? নিজের মুঠোর চার ভাগের এক ভাগকে বলে অংগুল ; এ রকম বার অংগুল বা অংগুলিতে এক তাল। নর মূর্তির দশ তাল, ক্রূর মূর্তির বার তাল, অসুর মূর্তির ষোল তাল, বালা মূর্তির পাঁচ তাল এবং কুমার মূর্তির দু'তাল। রামচন্দ্র, বলী, ইন্দ্র প্রভৃতির মূর্তি তৈরি করতে 'নর' বা 'দশ তাল' পরিমাণ। চণ্ডী, নরসিংহ, বরাহদেব প্রভৃতির জন্য 'ক্রূর' বা 'বার তাল' পরিমাণ। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির জন্য 'আসুর' বা 'ষোল তাল'। 'গোপাল' প্রভৃতির জন্য 'বালা' বা 'পাঁচ তাল'। বামন, উমা, কৃষ্ণসখা প্রভৃতি অতরুণ মূর্তির জন্য 'কুমার' বা 'দু'তাল'।

আগে শিল্পী পরে শাস্ত্র ঃ

উপরে যা বলা হল তা বাৎস্যায়ন মুনির কামসূত্র ও যশোধরের লেখা ঐ সূত্রের টীকায় বা অন্য শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শুক্রাচার্য প্রভৃতির লেখা শাস্ত্রের অভাব নেই। কিন্তু সব শিল্পীকে, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে, আগে শিল্পী শিল্প রচনা করেছিলেন তারপর শিক্ষার্থীদের নিয়মকানুন বেঁধে শাস্ত্র তৈরি হয়েছিল। যেমন আগে ভাষ্য তৈরি হয়, তারপর হয় তার ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ধরে ভাষ্য তৈরি হয়নি। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের ভাষ্য শাস্ত্র। আগে মূর্তি তৈরি হয়েছিল, তারপর মূর্তির লক্ষণ, বিচার, মান, পরিমাণ ঠিক করেছিলেন শাস্ত্রকারেরা। স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র মুখস্থ করলেই ধার্মিক হওয়া যায় না, তেমনি চিত্রবিদ্যার শাস্ত্র আয়ত্ত করলেই ভাল চিত্রকর হওয়া যায় না, তাঁর স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা থাকা চাই। শাস্ত্রশিক্ষা অনেকটা ছোটবেলায় পাখীর বাসায় ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার মতো। যখন খোলা আকাশে উড়তে পারে, তখন সে যেখানে ইচ্ছা গিয়ে পরে নিজে আলাদা বাসা তৈরি করতে পারে। চিত্রশিল্পীও নতুন নিয়ম, নতুন আদর্শ দিয়ে নতুন শাস্ত্র রচনা করতে পারে।

মুসলমান যুগ ঃ

মুসলমান যুগে পাঠান রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের কোনও সমাদর ছিল না। মুসলমান শাস্ত্রে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ থাকায়, কোন রকম চিত্রশিল্পই সুলতানদের আমলে উৎসাহ পায় নি, কিন্তু মোগল সম্রাটদের সময় চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পরীতির সংগে চীন, ইরাণ, ব্যাকট্রিয়া ইত্যাদি দেশের শিল্পের সংগে সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আকবরের আমল হতে ভারতে পারস্য ও চীন শিল্পের সংমিশ্রণে এক নতুন চিত্রশিল্পের কৌশল দেখা দেয়। আকবর ও জাহাংগীর বাদশাহের চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শাহজাহানের আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মতো চিত্র-শিল্পের দিকে ততো ঝোঁক দেখা যায়নি। জাহাংগীরের সময় জন্তু-চিত্রশিল্পের প্রসিদ্ধ শিল্পী মনসুর এবং মনুষ্য-চিত্রশিল্পী বিষণ দাসের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী কেশব ও মাধবের নামও প্রসিদ্ধ ছিল। মোগল-দিগের সময় রাজপুত চিত্রশিল্পও খুব উন্নত হয়েছিল।

একালের চিত্রশিল্পী ঃ

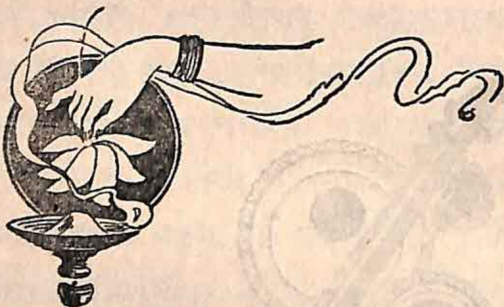
ভারতের আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বাংলার গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু,

অসিত হালদার, যামিনী রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতেই হবে। বাংলায় যে নতুন চিত্রধারার চলন আরম্ভ হয়েছে, তার পথ দেখিয়েছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নানাপ্রকার নতুন উন্মেষ গগনেন্দ্রনাথের রেখা ও বর্ণে প্রথম দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে বিদেশী কলা, বিশেষ চীন ও জাপানের চিত্রকলার ছাপ আছে মনে হতে পারে। কিন্তু তা মোটেই অনুকরণ নয়, ভারতীয় চিত্রশিল্পকে নতুন দৃষ্টি ভংগীর ছাঁচে ঢালা। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, নানা শিল্পের নানা প্রথা-প্রকরণ শিল্পীকে দেশ-বিদেশ থেকে আদায় করতে হয় চটপট ; তবে বিচার বিবেচনা ক'রে রীতি ঠিক করতে হবে। বোম্বাইয়ের বর্তমান চিত্রশিল্পীদের মধ্যে মানস্যরাম ও তরুণিকা এই দম্পতী এবং পি. জি. নিরুর মাদ্রাজের গুরুস্বামী ও বেংকটাপ্পার নাম করা যেতে পারে।

ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্পকে দেশের নতুন জাগরণের সংগে যে ভাবে পুনর্জীবন দেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তার ফল ফলতেই হবে। আশার কথা, রাষ্ট্র নানাভাবে দেশময় উৎসাহের সাড়া আনিয়ে দিচ্ছেন।



ভারতের সংগীতকলা



"গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠিছে রাগিণী ;
গীতগুঞ্জন কূজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে ।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা, বায়ু বাজাইছে শঙ্খ ;
সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

সংগীতের ইতিহাস ঃ

আমরা এমন দেশে বাস করি যেখানে কবির কথায়, আমরা 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে'।

আমাদের ভারতবর্ষকে গানের দেশ বলা চলে। শিশুরা ছড়া ও গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে; চাষীরা গান করতে করতে চাষ করে; মাঝিরা গান করতে করতে নৌকা বায়, এমন কি মেয়েরাও গান করতে করতে শুধু বিবাহ আদির মাংগলিক কাজ করে না, যাঁতা ঘুরানো প্রভৃতি নানাবিধ সংসারের কাজও করেন। রাজপুতদের ইতিকাহিনীর ধারা তাদের চারণ-কবিরা গানের মধ্য দিয়েই বজায় রাখতেন।

এ গান শুধু আধুনিক যুগের জিনিস নয়, অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হতে গানের ধারা চলে আসছে। বৈদিক যুগে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত তিন রকম স্বরে অর্থাৎ সুরে বেদের মন্ত্র পড়া হত, এখনও যজ্ঞাদিতে সাম গান শুনা যায়। আজকাল সংগীতের যে সাতটি সুর পাওয়া যায়, মনে হয় তাও ঐ বৈদিক যুগের স্বর হতে নেওয়া। দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ, দেশজয় ও বংশাবলীর জয়ধ্বনির মধ্যে বীণা ও সেতারের আওয়াজ পাওয়া কঠিন। তাই সংগীতশাস্ত্রের ধারাবাহিক

ইতিহাস পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগে লব কুশের গান আদির কথা আছে। তারপর হিন্দু সভ্যতার উন্নত অবস্থায় সংগীতের উন্নতির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান বাদশাহের সময় যে ওস্তাদী গান বহুল প্রচারিত ছিল, তার ধারা এখনও চলে আসছে। সম্রাট আলাউদ্দিন ও আকবরের সময়ে সংগীতের যে বিশেষ চর্চা ছিল তার বিস্তর প্রমাণ আছে।

ভারতবর্ষে সংগীতচর্চা অন্ততঃ তিন হাজার বছর চলে আসছে, উপরে যে বৈদিকযুগের সংগীতচর্চার কথা বলা হয়েছে, তার অনেক পরেও বৌদ্ধযুগে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানের সময় ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও অন্য সকল কাজ-কর্মের মধ্যেও উন্নত সংগীতচর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে উন্নতি খ্রীষ্টাব্দ সুরু হওয়ার অনেক আগেকার কথা। গুপ্ত সম্রাটদের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টের পর চার শ' হতে ছশ' বছরের মধ্যে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। ভারতের সংগীত ও নৃত্য সম্বন্ধে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই সময়েই লেখা হয়।

সেকাল ও একাল ঃ

আমাদের দেশে এখনকার মতো সাধারণের উপভোগ ও শিক্ষার জন্য একত্র সংগীতচর্চার ব্যবস্থা

ছিল না। মনে হয় সংগীত শিল্পীরা রসগ্রাহী ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতচর্চারও উন্নতির সুযোগ পেতেন। দেশের রাজা ও অভিজাতরা শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন ও পোষণ করতেন,—নিজেদের ও বন্ধু বান্ধবদের আনন্দ লাভের জন্য। আর ছিল মন্দির-সংগীত; মন্দিরের গায়ক-গায়িকারা ছিলেন সেই মন্দিরের দেবতার দাস ও দাসী। জগন্নাথদেবের মন্দির বা ভারতের অন্য কোন কোন মন্দিরে দেবদাস ও দেবদাসী নাচের সংগে গান শুনিয়ে দেবতার সেবা করতেন। জন্ম হতেই তাঁদের এ কাজে উৎসর্গ করা হত। তাঁদের সংসার ধর্ম কিছুই নেই। দেবতাদের সেবা করাই তাঁদের কাজ, দেবতাই তাঁদের সব।

সংগীত ও নাদব্রহ্ম :

শুধু দেবদাস-দেবদাসীরাই গানকে দেবতা তুষ্ট করার সহজ উপায় মনে করতেন তা নয়; আমাদের আর্যঋষিরাও আত্মাকে ভগবানের চরণে নিবেদন করবার সবচেয়ে সহজ অথচ আনন্দময় পথ দেখেছিলেন সংগীতে। এর ভিতর দিয়েই জীবনের সব কিছুই, সকল "পুরুষার্থ" লাভ করা সম্ভব জানতে পেরেছিলেন। সংগীত বললে আমরা বুঝি কয়েকটি কাজ বা স্বরের এমন

ছন্দোময় ক্রমবিন্যাস, যা মানুষের মনে বিমল আনন্দ এনে দেয়। এই শব্দ বা 'নাদ' বিশ্বের অণুপরমাণুতে যেয়ে আঘাত করে এবং এইজন্য সংগীত শিল্পীরা চারিপাশে এক আনন্দময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেন। কবিরা এজন্য বায়ুমণ্ডলের মধ্যেও গানের সুর শুনতে পান; এবং ত্রিকালদর্শী ঋষিরা এই শব্দ বা 'নাদ'কে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। তাই শোনা যায়, দীপক রাগ গাওয়া হলে আগুন জ্বলে উঠত, আবার মেঘমল্লার রাগ গাওয়া হলে বৃষ্টি নেমে সে আগুন নিভিয়ে দিত।

রাগ-রাগিণীর প্রভাব ঃ

এ নিয়ে যে কাহিনী চলে আসছে সেটা শোনবার মতো। প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের নাম সকলেই জানেন। তিনি আকবর বাদশাহের সভাসদ ও প্রিয় গায়ক ছিলেন। তাঁকে মিঞা তানসেন বলা হলেও আসলে তিনি হিন্দু, নাম ছিল রামতনু। আকবর বাদশা তাঁর গান শুনে তাঁকে 'তানসেন' উপাধি দিলেন। এ উপাধির মানে—যিনি 'তান' দিয়ে 'সেন' অর্থাৎ প্রাণমুগ্ধ করতে পারেন। তানসেনের উপর বাদশাহের অসীম প্রীতি ও ভূরি ভূরি বহুমূল্য উপহার বর্ষণ দেখে

অন্য সভাসদরা, বিশেষ করে গায়করা তাঁর প্রাণ নষ্ট করার এক উপায় স্থির করলেন। একদিন তাঁরা দরবারে বাদশাকে জানালেন, 'জাহাপনা! আমরা কখনো দীপক রাগ শুনিনি, মিঞা তানসেন ছাড়া আর কোন ওস্তাদই এ রাগ জানেন না; আপনি যদি তানসেনকে হুকুম করেন, তবে আমরা সেই রাগ শুনতে পাই।' বাদশা প্রস্তাবটা সরলভাবে নিয়ে তানসেনের কাছে সেরূপ প্রস্তাব করলেন। তানসেন বললেন, 'জাহাপনা! দীপক রাগের তেজ অতিশয় ভয়ংকর। এ মর জগতের গায়ক তার তাপ সহ্য করতে পারে না, এই রাগ আলাপ করলে মৃত্যু হবেই।'

কিন্তু বাদশা নাছোড়বান্দা, সুতরাং তানসেন স্বীকার করলেন ও পনের দিনের সময় চাইলেন। বাদশাকে তিনি বললেন, 'গান সুরু হওয়ার আগে সভার চারিদিকে যেন প্রদীপের আলো সাজিয়ে রাখা হয়, প্রদীপগুলি জ্বলে উঠবামাত্র আমি গান বন্ধ করব।' একটি দিন ঠিক হোল। সেদিন দুপুরবেলা গান আরম্ভ করা হবে স্থির রইল।

এই পনের দিনের মধ্যে তানসেন তাঁর মেয়ে সরস্বতী ও তাঁর গুরু হরিদাস স্বামীর শিষ্যা রূপবতীকে মেঘমল্লার রাগ শিক্ষা দিলেন। ঠিক দিনে সভা আরম্ভ

হোল। সভায় লোকে লোকারণ্য, কত রাজা, উজীর, নবাব, সভাসদ্ যে উপস্থিত হলেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রাতে তানসেন সভায় এলেন। প্রাতঃকালেই তিনি দীপক রাগের পূজা ও আহ্বান আরম্ভ করলেন। এদিকে তানসেনের উপদেশ মতো নির্দিষ্ট সময়ে সরস্বতী ও রূপবতী নিজ নিজ গৃহে মেঘরাগের পূজা ও আলাপ আরম্ভ করলেন। আকবর বাদশাহ সভায় উপস্থিত হলেন। তানসেন এবার বাদশাহের অনুমতি নিয়ে দীপক রাগের আলাপ আরম্ভ করলেন। প্রথম আলাপেই সভায় সকলে দারুণ গরম অনুভব করতে লাগলেন। উপস্থিত শ্রোতারা এবং তানসেন ঘামে ভাসতে লাগলেন। দ্বিতীয় আলাপে তানসেনের দুই চোখ রক্তবর্ণ হল। মনে হল, যেন তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত ঠিকরে পড়ছে। তৃতীয় আলাপ শেষ হওয়া মাত্র প্রদীপগুলি জ্বলে উঠল। সভার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠল। সভায় সকলে নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। তানসেনও অর্ধ দগ্ধ অবস্থায় তাঁর গৃহের দিকে ছুটলেন। তানসেন গৃহে উপস্থিত হওয়ামাত্র রূপবতী মেঘরাগ আলাপ করলেন। আলাপের সংগে সংগে আকাশ মেঘে ভরে গেল, প্রবলবেগে বাতাস বইতে লাগল, আর বিদ্যুতের চমকে ও বজ্রের ভীষণ

শব্দে দশদিক কেঁপে উঠল। দ্বিতীয়বার আলাপে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে ধরাতল প্লাবিত করে দিল, আর তানসেনের অর্ধ দগ্ধ শরীরও শীতল বারি স্পর্শে স্নিগ্ধ হল। তানসেন পুনর্জীবন লাভ করলেন।

সংগীত ও দর্শনতত্ত্ব ঃ

দু হাজার বছর আগে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির লেখা থেকে বোঝা যায় যে সংগীততত্ত্ব বুঝতে হলে অন্য রকম আরো অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সেই জ্ঞানকে আমরা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানবার ও পাওয়ার মতো জ্ঞান বলে থাকি। সংগীতের তত্ত্বের সংগে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের কোন না কোন তত্ত্বের যোগ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য এমন সব কথা বলেছেন যা থেকে বোঝা যায় যে যিনি বীণা বাজানোর সকল রকম তত্ত্ব জানেন এবং তাল বিষয়ে যাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও অভ্যাস আছে তিনি অন্য কিছু না করেই মোক্ষলাভ করতে পারেন ; বীণা বাজাবার তত্ত্ব বলতে বুঝতে হবে তার মুল ব্যাপারগুলি ও তার বিভিন্ন শ্রেণী বা প্রকার। ঐ মোক্ষ মানে মুক্তির অর্থাৎ সংসারের সকল রকম বন্ধন ও সংস্কার থেকে ছাড় পাওয়া। সংগীতশিল্পী বা তাঁর সংগে যাঁরা সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করেন গান-বাজনার

সময় তাঁরা সেই আনন্দসায়রে ডুবে যায়, নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেন। সারা বিশ্বে সকল সময় বিমল আনন্দে ভরা ভগবানের যে লীলা চলছে তার সংগে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সংগীত-শিল্পীর যোগ এসে যায়; তিনি অমৃতের আস্বাদ পান।

প্রাচীন সংগীত শাস্ত্র ঃ

আমরা প্রাচীনকালে সংগীত ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারি যে সকল গ্রন্থ থেকে তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানো ভরত মুনির 'নাচশাস্ত্রের' কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া শারঙ্গদেবের 'সংগীত-রত্নাকর', নারদের 'সংগীত-মকরন্দ', সোমনাথের 'রাগ-বিবোধ', দামোদরের 'সংগীতদর্পণ', লোচন পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিনী' প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। এর মধ্যে সব কিছু জানবার মতো বই 'সংগীত-রত্নাকর' প্রায় সাত শত বছর আগের লেখা। সংগীত বলতে প্রাচীনরা কি বুঝতেন, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সংগীত কি, কি করলে সংগীত উৎকৃষ্ট করা যায়, সংগীতের উদ্দেশ্য কি, এ সকল বিষয়ে প্রাচীনদের চিন্তাধারা সবই এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সংগীতের আসর ঃ

আমরা যাকে গানের আসরপাতা বলি; তাকে সেকালে বলত কুতপবিন্যাস। সংগীত বললে শুধু গান

বোঝাত না, তার সংগে বাদ্য ত বোঝাতই; নৃত্যও বোঝাত। আদর্শ সংগীত বোঝাতে গান-বাজনা দুই বোঝাত। গীতবাদ্য অথবা বাদ্যনৃত্য এরূপ ব্যবস্থা হোত। তিনটির সমাবেশ ত ছিলই। ভরত মুনি বলেছেন, মেয়েরা গাইবেন এবং সেই সংগে পুরুষরা বাজাবেন; কারণ মেয়েদের গলা বেশী মিষ্টি, তবে 'রত্নাকরে' নর-নারী উভয়েরই গান করার কথা আছে। এ থেকে বোঝা যায়, একালের মতো সেকালেও মেয়েদের গান করা প্রথার বেশ চলন ছিল। সংস্কৃত নাটক-নাটিকাতে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। নাচ সম্বন্ধেও নর্তক-নর্তকী দুয়ের প্রয়োজন হোত।

কথা ও সুর:

গানের কথা ও সুরের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; এ দুটিই না হলে গান সম্পূর্ণ হয় না, গানের কথায় কাব্যের প্রকাশ যতই থাক না কেন, সুর যোগ হলেই তবে সেটা সংগীত পর্যায়ে আসবে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানের মধ্যে সুর ভাঁজাই প্রধান। গানের কথা অংশটি তার মধ্যে বোঝাই যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যে সুর দিয়ে গেছেন তা মিষ্টি হলেও তা সুর-প্রধান নয়, কথা-প্রধান। যাঁরা ওস্তাদী গান বুঝতে পারেন না এবং

সেজন্য পছন্দ করেন না, তাঁরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।

দিল্লীতে উচ্চাংগ সংগীতের ঘরাণা অথবা চক্র যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তানরস যাঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ঊনিশ শতকের লোক। এই ঘরাণা বা চক্রের সম্পদ প্রধানতঃ যন্ত্র সংগীতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতের সমন্বয় করতে গিয়ে এ ঘরাণার পূর্বাচার্যরা যে সচেতনতা দেখিয়েছেন তা বর্তমানে কমে এলেও নব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ ধারা অগ্রাহ্য করা যায় না।

তানসেন সম্বন্ধে আরো কথা ঃ

পূর্বে রাগ-রাগিণীর প্রকৃতির উপর প্রভাবের কথা বলার সময় মিঞা তানসেনের কথা বলা হয়েছে, 'তানসেন' রামতনুর উপাধি মাত্র ; এটা কতক লোকের মত। আবার অনেকে জোর দিয়েই বলেন, তিনি গোয়ালিয়রের মকরন্দ বা মুকুন্দরাম পাণ্ডের ছেলে তান্ন মিশ্র। তাঁদের বাড়ীর নিকটেই হজরু ঘৌষ মহম্মদ নামে এক সিদ্ধ ফকির ছিলেন। তান্ন মিশ্রের মার সন্তান না হওয়ায় ফকিরের আশীর্বাদ চান। তার কিছুদিন পরেই তান্নজীর জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই তাঁর এমন

শক্তি ছিল যে তিনি যে কোন জানোয়ারের ডাক শুনেই সংগে সংগে সেরকম ডাকতে পারতেন। তাঁদের ক্ষেত বাগানের জিনিসপত্র খুব চুরি হোত। তিনি একবার তাঁর বাবার সংগে দূরদেশে যাওয়ার সময় বাঘের ডাক শুনেছিলেন। তাঁর বাবার কথামত রাতের বেলা বাগানে বসে বাঘের ডাক ডাকতে চোরেরা বাঘ এসেছে মনে করে পালিয়ে যেত। কিন্তু যখন বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী সাধু হরিদাস স্বামী লোকালয়ের মধ্যে যেতে যেতে এই বাঘের ডাক শুনলেন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ছেলেটিকে ডেকে তার ক্ষমতা পরীক্ষা করলেন। শুধু বাঘের ডাক নয়, যে কোন পাখীর ডাক বাগানে শুনে সেই রকম ডাকতে বা গাইতে পারলেন। তান্ন মিশ্রকে শিষ্য করে তিনি পাঁচ বছর শিক্ষা দিলেন। ঘরে ফিরে আসার পর তাঁর মা, বাবা আবার ফকিরের আশীর্বাদ নিতে গেলেন; আশীর্বাদ পেলেন। কিন্তু সেই ফকিরের মুখের পানের একটুকরো তান্ন মিশ্রের মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—এ একজন বিখ্যাত গায়ক হবে। কিন্তু জাত গেল, বামুনের ছেলে মুসলমান মিঞা তানসেন হয়ে গেলেন।

তানসেন প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের প্রধান গায়ক হলেন। পরে আকবর বাদশার নবরত্নের মধ্যে স্থান পেলেন। তিনি যে সংগীতের ধারা তৈরি করে

গিয়েছেন তার তুলনা নেই। তিনি 'ধ্রুপদ' বেশী গাইতেন, তাই আকবরের সময় 'ধ্রুপদে'র চরম উৎকর্ষ হয়েছিল। আকবরের দরবারে তানসেন ছাড়া আরো তিনজন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বুজচাঁদ, রাজা সামোখান সিং ও শ্রীচাঁদ।

গোয়ালিয়রে সংগীত চর্চা :

তানসেনের কোথায় বাড়ী এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও তানসেনকে গোয়ালিয়রের লোক বলা ভুল না হতে পারে। কারণ, সে সময় গোয়ালিয়র রাজ্যেই গানের চর্চা ও সমাদর সবচেয়ে বেশী ছিল। সংগীতের নতুন এক ধারা আমদানি বা আবিষ্কার করেন গোয়ালিয়রের মহারাজা মানতানওয়ার। সে আজ প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার কথা। তাঁরই সময়ে বিখ্যাত শ্রীনায়ক কক্ষুর নেতৃত্বে গোয়ালিয়রে সংগীতের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই রাজা মানের নিকট সংগীত অনুরাগীমাত্রকেই চিরঋণী থাকতে হবে। কারণ তাঁরই প্রেরণায় সাধু হরিদাস স্বামী ও তাঁর শিষ্য তানসেনের সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ হয়।

সুরতীর্থ বিষ্ণুপুর :

বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর, সুর সাধনার অন্যতম পীঠস্থান বলা চলে। শুধু রাজদরবারে

নয়, বাংলার রসিক-সমাজেও বিষ্ণুপুরের সংগীত-সাধকরাও প্রায় তিনশ' বছর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরের সাধনা সকলকেই চমৎকৃত করেছিল। শুধু বাংলার রাজধানী কলিকাতায় নয় আরও নানাস্থানে এই সাধনা ছড়িয়ে পড়েছিল, বিষ্ণুপুরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগীত-চর্চার প্রসার সম্ভব হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে লোক-সংগীত ও উচ্চাংগ-সংগীত দুইয়ের চর্চা সমান ভাবেই হয়েছিল। কবি-গান, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, ঝুমুরের যেমন খ্যাতি ছড়িয়েছিল তেমনি উচ্চাংগ-সংগীতেরও প্রসিদ্ধি কম ছিল না। দিল্লীর ওস্তাদদের মধ্যে বাহাদুর খাঁ এবং মৃদংগ-বিশারদ পীর বক্সকে বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ মাসিক পাঁচশত টাকা দিয়ে বিষ্ণুপুরে এনেছিলেন। বাহাদুর খাঁর প্রধান সাকরেদ ছিলেন গঙ্গাধর চক্রবর্তী। ঐ চক্রবর্তী বংশের নীলমাধব চক্রবর্তী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে গান শিখিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের সার্থক সুরসাধকদের মধ্যে সংগীত-গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদু ভট্ট, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, হারাধন চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ ও নীলমাধব চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোস্বামী বা জ্ঞান গোঁসাই, জলধর গোস্বামী বা হলু গোঁসাই, নকুড়চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সংগীতজ্ঞদের নাম উল্লেখযোগ্য। মৃদংগ-বাদকদের মধ্যে মৃদংগ-বিশারদ রামমোহন চক্রবর্তী, জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃদংগাচার্য শ্রীপতি অধিকারী, অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, গিরীশ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব চক্রবর্তী প্রভৃতি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

লোকগীতির গায়কদের মধ্যে নন্দলালের রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মা ও ব্রজনাথ রজকের যাত্রার দল, রজনী মাঝি ও কেশব মাঝির তর্জার দল, সরোজিনী বসুর গান ও নাচের দল বিখ্যাত। কথকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই প্রথম কথকতা শিক্ষার টোল খুলেন। তাঁর বড় ছেলে রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কথক-চূড়ামণি ছিলেন। এই বংশেই জন্মেছিলেন বর্ত্তমান যুগের সংগীত-শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

দাক্ষিণাত্যের সংগীত :

দাক্ষিণাত্যের সংগীতের রীতিকে 'কর্ণাটিক' রীতি বলে। অতি প্রাচীনকাল হতে কর্ণাটের সংগীত প্রসিদ্ধ। এখানে সুমধুর সংগীতের সংগে সংগাততত্ত্বও বিশেষভাবে আলোচিত হত এবং এখনো হয়। সুগায়ক অথচ গানের পেছনে যে দার্শনিক রহস্য রয়েছে তার সম্বন্ধে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে থ্যাগরাজ, শ্যাম শাস্ত্রী ও দিক্ষিতারের নাম উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যের সংগীত-সহায়ক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, মৃদংগম্ ও নাদস্বরম্ প্রাচীন ও বিখ্যাত।

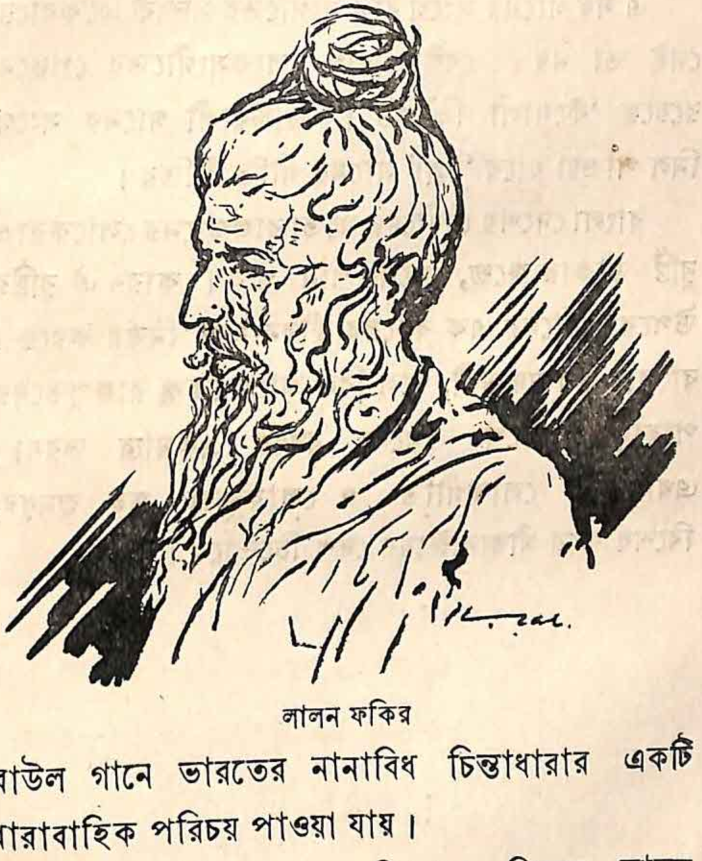
লোকগীতি :

ভারতে একশ'র মধ্যে প্রায় নব্বুই জন থাকেন গ্রামে অর্থাৎ দেশের একটা বৃহৎ শক্তি পল্লীতেই আছে। এই শক্তি ধর্মের সংস্কার, আচার ব্যবহার ও নানারকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সহজেই বিকশিত হয়ে পড়ে। তাই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সহজেই তাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে বাংলার পল্লীগীতিকে আশ্রয় করে যে বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে রয়েছে সবল সক্রিয় সমাজ ও জনমন। তাই বাংলার লোকসংগীত কেবল চাষীর

গান নয়, সমগ্র জন সাধারণের কর্মধারার সংগে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তার সুখে দুঃখে, তার উৎসবে ব্যসনে, তার অন্নচিন্তায় ও ধর্মচিন্তায় এই লোকগীতির উৎপত্তি ও বিকাশ। লোক-গীতির মূল আবেদন এক হলেও, তাতে নানা বৈচিত্র্য আছে। বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, গম্ভীরা, গাজীর গান, ভাটের গান, হাপু, জারি, ঘেঁটু, ভাদু ইত্যাদি নানা রকমের গান গ্রামবাসীর অন্তর ছেয়ে আছে।

পল্লীগাতি দু'রকম পাওয়া যায়। এক রকম, যা সুর ছাড়া অচল, যেমন বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি। আর এক রকম, যাকে কবিতাও বলা চলে, যেমন, ভাটের গান। ভাটিয়ালিতে ছন্দ নেই। তার গতি মন্দ মন্থর, কিন্তু সারিগান ঠাসবুনোন, তার গতি দ্রুত। দুই রকমই মাঝিরা গেয়ে থাকে। এই প্রভেদের প্রধান কারণ, সারিগান বহু লোকের এক সংগে গাওয়া গান; সেইজন্য এর মধ্যে ছন্দ, তাল না হলে চলে না। সারিগান শুধু নৌকা বাওয়ার সময় গাওয়া হয় না। ধান কাটার সময়, ছাদ পেটার সময় ঐ জাতীয় গান গাওয়া হয়; তার নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, আসলে সেটা সারি গান। সারি বেঁধে বসে গান করা হয় বলে এই গানের নাম 'সারি'।

বাউল গান আমাদের দেশের একটি অমূল্য সম্পদ। এর সুরে পল্লীর মানুষের প্রাণের কথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এতে আছে দরদীয়া 'মনের মানুষের' সাধনা। এর সহজসাধনে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে আছে।



লালন ফকির

বাউল গানে ভারতের নানাবিধ চিন্তাধারার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়।

বাউল কবিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন লালন

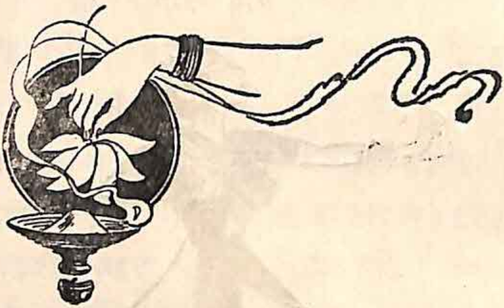
ফকির। ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করে গেছেন যে তিনি অনেকাংশে লালনের কাছে ঋণী। বাউলের সহজ-সাধন কবিকে মুগ্ধ করেছিল।

এ সব গানের সংগে রাগ সংগীতের সম্পর্ক একেবারে নেই তা নয়। বেশীর ভাগ লোকসংগীতের পেছনে রয়েছে 'কঁসোলী ঝিঁঝিট'। ভাটিয়ালী গানের সংগে মিল পাওয়া যাবে 'টপ্পা' নামের গীতি রীতির।

বাংলা দেশের চাষীদের মতো রাজস্থানের লোকেরাও বৃষ্টি ডাকার জন্যে, মেঘের গান গায়। কারণ ঐ বৃষ্টির উপরেই তাদের এক বছরের জীবন মরণ নির্ভর করছে। বাংলায় তবু নদ-নদী, খাল-বিল আছে কিন্তু রাজপুতদের পাহাড়ী দেশে মেঘের বর্ষণই একমাত্র ভরসা। এখানকার লোকগীতি ও লোকনৃত্য দুই সুমধুর, বিশেষ করে মীরাবাঈয়ের দেশ চিতোরে।



ভারতের নৃত্যকলা



"হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো-মন্দ তালে তালে ॥
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বজুড়ে নৃত্য ঃ

কবিগুরু ঠিকই গেয়ে গেছেন—'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে।' সবার চিত্তেই সব সময় নাচের স্থর বাজছে। বাইরে তার প্রকাশ হোক বা না হোক। শুধু ছোট শিশুরাই নাচে না; কি আনন্দে, কি রাগে, বড়রাও নাচে, যেমন পরের কথায় নাচ, আনন্দে নেচে উঠা, ভোজনের নিমন্ত্রণ পেলে ব্রাহ্মণদের নেচে উঠা। শুধু কি মানুষেরাই নাচে, জীব-জন্তু মাত্রেই নাচে, এমন কি আকাশ-বাতাস সবই নাচছে। মহাশূন্যে তারার নাচ, আকাশে মেঘ ও বিদ্যুতের নাচ, বাতাসে ইথারের নাচ, বাতাসের নাচের তালে নদনদী, হ্রদ তড়াগের নাচ, স্বয়ং মহাদেব নটরাজ মূর্তিতে নেচে নেচে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করছেন।

নটরাজের নৃত্য ঃ

'শিব-প্রদোষ-সূত্রে' শিবের নাচের এক রকম বিবরণ পাই, "বিশ্ব জননীকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তিনি কৈলাসের শিখরে নৃত্য করছেন, দেবতারা তাঁকে ঘিরে আছেন, সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন, ইন্দ্র বেণুতে ফুৎকার দিচ্ছেন, ব্রহ্মা করতাল ধ্বনি করছেন, লক্ষ্মী গান

গাচ্ছেন, আর বিষ্ণু ঢোলে ঘা দিচ্ছেন, আর সব দেবতারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যার এই অপূর্ব স্বর্গীয় নৃত্য ও সংগীত ত্রিজগতের গন্ধর্ব, যক্ষ, পতগ (যারা উড়ে বেড়ায়), উরগ (যারা বুকের উপর হাঁটে) সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, অমর, অপ্সরা প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি দর্শন ও শ্রবণ করছেন।”

নটরাজের আর এক রকমের নৃত্যের বর্ণনা আছে। “প্রভু নৃত্য করছেন, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি থাকে তেমনি তাঁর শক্তি বিশ্বের চিত্ত ও বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত করছেন এবং ফলে তারাও আবার নৃত্য করছে, এই নৃত্য তাঁর পঞ্চ কৃত্যের নিদর্শন—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহেই মুক্তি। একাধারে পঞ্চ দেবতার নৃত্য অর্থাৎ কৃত্য হচ্ছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর এবং সদাশিব। ডমরু হতে সৃষ্টি, হাত হতে আশা অর্থাৎ স্থিতি, হাতের যজ্ঞাগ্নি থেকে সংহার, এবং উঠানো পা থেকে মুক্তি।

নৃত্যের উৎপত্তি ঃ

সংগীত রত্নাকরে নৃত্যের উৎপত্তির কথা আছে। সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ। গান্ধর্ববেদে সংগীতকেই প্রধান বললেও নৃত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার

জন্য একটি নাট্যবেদও তৈরী করা হয়েছে, নৃত্য-গীত ও বাদ্যর সংগে ঠিক মতো চললে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সংগীত বলে গণ্য হতে পারে। নাট্যের দ্বারা যা কিছু প্রকাশ্য হয়, তা এই তিনের দ্বারাই ব্যক্ত করা যেতে পারে। যেমন হয় মূক অভিনয়ে।

"নৃত্" ধাতু থেকে নৃত্য কথাটা হয়েছে। এর মানে গাত্রবিক্ষেপ করা, চলতি ভাষায় গা হাত পা নাড়া। এই গা হাত পা নাড়ার দ্বারা ঠিক মতো ভাব প্রকাশ করতে পারলে আদর্শ নৃত্য হোল। আমরা তিন রকম প্রয়োজনে এ রকম গা হাত পা নাড়ি। শিশুরা যেমন স্বাভাবিক অংগ চালনা করে বা তরুণরা যেমন অংগ চালনার দ্বারা ব্যায়াম করে। এ রকম অংগ চালনায় মনের কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ পায় না। অংগ চালনা করার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা মাত্র। আবার মনের কোন বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করার জন্য অংগ বিক্ষেপ করা হয়। সংগীতের উদ্দেশ্যের উপযোগী করে বিশেষ রকম ভাব প্রকাশের জন্যে যে অংগ চালনা তাকে নৃত্য বা ভাব-নৃত্য বলে। এই হোল হিন্দুস্থানের নৃত্য। সব চেয়ে মনোরম যে হিন্দী ঠুংরি গান তার সংগে এই ভাব নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আবার কোন বিশেষ ভাব না ফুটিয়েও

কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুকরণ করার জন্য অংগ বিক্ষেপ দরকার হতে পারে। এই অনুকরণ যা বর্তমানে বা অতীতে ঘটেছে সেই দুই রকমেই হতে পারে। এই অনুকরণাত্মক অংগ চেষ্টাই হোল 'নাট্য' অর্থাৎ অভিনয়ে যে নৃত্য দেখান হয়।

এই তিনটি ছাড়া সংগীতের উপযোগী নৃত্যের আর কোন নিজস্ব পরিকল্পনা সম্ভবপর নয়। প্রাচীনরা কি সুন্দর শ্রেণী ভাগই করে নিয়েছেন!

প্রাচীনকালের নৃত্যের সমাদর ঃ

অতি প্রাচীনকালে ঋগ্বেদের সময়েও মেয়েদের নৃত্যের কথা আছে। রামায়ণ থেকে জানতে পারা যায় যে, অযোধ্যা নর্তক-নর্তকী, এবং গায়ক-গায়িকায় পরিপূর্ণ ছিল। রাবণের সোনার লংকাপুরীতে নৃত্য-গীতের বর্ণনা আছে। সেখানে একজন গায়িকা নৃত্যের পর সেই ভঙ্গিতেই ঘুমিয়ে ছিল জানা যায়। মহাভারতে বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুন নৃত্য-গীত এত ভাল জানতেন যে বিরাটরাজার প্রাসাদে গুপ্তভাবে থাকবার সময় তিনি বৃহন্নলা নাম নিয়ে বিরাটকন্যা উত্তরাকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। দু'হাজার বছর আগেও যে নৃত্য-গীতের শিক্ষা ও সমাদর ছিল কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং অন্য নাটকে ও কাব্যে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।



কেরালার কথাকলি নৃত্যনাট্য

তামিল রাজ্যের কৌশিকনারের 'মলয়ীশ তুকন্দাম' গ্রন্থে নৃত্যশিল্পের বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়।

ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি ঃ

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'ভারতনাট্যম্'। দক্ষিণ ভারতে এই রীতি প্রচলন অধিক। এই দেশে কেরলে প্রচলিত 'কথাকলি' এক রকম নৃত্যনাট্য। এতে নৃত্যের সংগে অংগভংগি ও ভাব প্রকাশ দ্বারা নাটক-নাটিকার ভাব ব্যক্ত হয়ে থাকে। নাচ-গান দিয়ে গল্প বলাই হল কথাকলি নৃত্যনাট্যের উদ্দেশ্য। এই নাচ লাস্য অর্থাৎ কোমল নাচ নয়। এ নাচ হল পুরুষালি নাচ বা তাণ্ডব নাচ। তবে শান্ত নাচও আছে এতে। কিন্তু তা খুব কম—বড় নাচের মধ্যে তা চাটনির মতো মাঝে মাঝে আনা হয়।

মণিপুরী নৃত্য ঃ

মণিপুরে অনেক দিন থেকেই লোক-নৃত্য চলে আসছে। কিন্তু এই নাচের সারা ভারতে প্রচারের জন্য আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। তিনি ত্রিপুরার মহারাজের অতিথি হয়ে থাকার সময় এই নাচ দেখে মুগ্ধ হন এবং শান্তিনিকেতনে এই নাচের প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। প্রথম ব্যায়ামের দিক থেকে সংগীতের

চিন্তা আসে, পরে সেকালের মতো একালেও শিক্ষার মধ্যে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজা প্রথমে বুদ্ধিমন্ত সিংহকে নৃত্য-শিক্ষক করে পাঠান। তিনি চলে যাওয়ার পর আবার পাঠান নবকুমার সিংহকে। ছাত্র-ছাত্রী দুইয়েরই নৃত্যশিক্ষা হোত। ক্রমে শান্তিনিকেতনের আদর্শে শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে এই নৃত্যের প্রচার হোল, যার জন্যে এখন শিক্ষামন্দিরে নৃত্যকলা সমাদরে স্থান পেয়েছে। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়, আই. সি. এস. মণিপুরী ও অন্য লোকনৃত্য অবলম্বনে ব্রতচারী-নৃত্য প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা দেশের বিদ্যালয়ে ও অন্যত্র এই নৃত্য অনুসরণের ব্যবস্থা করেন।

মণিপুরী নাচের মধ্যে খোল বাজনার সংগে রাখাল বালকদের নৃত্য এবং মেয়েদের রাসনৃত্য প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যকলা অবলম্বনে তাঁর 'নটীর পূজা' 'চণ্ডালিকা', চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'উমার তপস্যা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন এবং আজও শুধু বাংলা দেশে নয় সারা ভারতে এই সব অভিনয় চলছে। শান্তিনিকেতনের প্রভাবে মণিপুরী নৃত্য অনেক স্থানে বিশেষ করে বোম্বাইয়ে সমাদর পায়। নবকুমার সিংহকে শিক্ষক ও

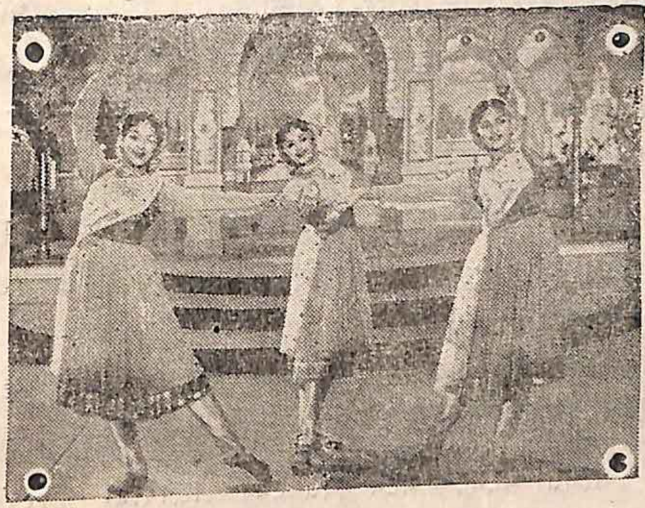


মণিপুরী নৃত্য

প্রচারক রূপে শান্তিনিকেতন থেকে বোম্বাইয়ে চলে যেতে হয়। ভারতের আধুনিক নৃত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতের কয়েকজন নৃত্যশিল্পী ঃ

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সব নৃত্যশিল্পী ভারতীয় নৃত্যকে জগতের দরবারে আসন ক'রে



ভারতের আধুনিক নৃত্যের একটি দৃশ্য

দিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে উদয়শংকর ও শান্তিদেব ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতনাট্যমের অন্যতম নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে মাদ্রাজের ই. কৃষ্ণ আয়ার, বালাসরস্বতী এবং তাঞ্জোরের

মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই, রামগোপাল, রুক্মিণী দেবী, তারা চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রচেষ্টায় ভারতনাট্যম প্রকৃত স্বীকৃতি পেয়েছে।

কেরালার কথাকলি নৃত্যের অন্যতম শিল্পীদের মধ্যে ভল্লাথোল, গুরু কুঞ্জরু, কুরুপ, মাধব মেনন, শংকরণ নাম্বুদ্রি, গোপীনাথ, শান্তা রাও, কেলু নায়ার, মৃণালিনী সারাভাই, পদ্মিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কথক নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে লাচ্চু মহারাজ, সিতারা, আটান মহারাজ, কুমুদিনী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

একালের মণিপুরী নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে গুরু অমুবি সিং, রাঘুবী সিং, ব্রজবাসী সিং, থম্বলা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জাবের লোকনৃত্য :

আমরা অনেকে মনে করি যে পাঞ্জাবীরা স্বভাবতঃ রুক্ষ কাটখোট্টা; তারা নাচতে গাইতে পারে মনেই হয় না। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল। তাদের কোমল অন্তরের পরিচয় পাই তাদের নাচে ও গানে। পাঞ্জাবের লোকগীত ও লোকনৃত্য থেকে আমরা জানতে পারি পাঞ্জাবীদের গভীর প্রেম, ভক্তি, সরলতা,



পাঞ্জাবের পুরুষরা ভাঙরা-নাচ নাচছে



পাঞ্জাবের মেয়েরা গিদ্দা-নাচ নাচছে

তাদের অসম্ভব ধৈর্য ও কর্মশক্তি, আর সবার চেয়ে তাদের মানবতাবোধ।

প্রথম লোকনৃত্য তাদের জাতীয় নৃত্য ভাঙরা, তাদের প্রাণ মাতানো আনন্দের নাচ। এ নাচে এত বেশী শরীর চালনা, গতি বহুল ভংগী, ও লম্ফ-ঝম্ফ যে কোমলতার লেশ মাত্র দেখা যায় না। এ নাচ পুরুষদের। নাচের সময় ঢোলক বাজানো হয়। একটা ছোট কাঠি ও একটা বড় কাঠি দিয়ে, ছোট কাঠিকে বলে 'ছড়ি' ও বড় কাঠিকে বলে 'খুন্তি'। এ ছাড়া এক রকমের বাঁশিও বাজে। তাকে বলে 'আলখোজা'। এর সংগে লোহার 'চিমটে' তাল দেয় ঐক্যতান বাদনে। পল্লী জীবনের অনেক খুঁটিনাটি এই ভাঙরা নাচের সময় যে গান গাওয়া হয় তাতে পাওয়া যায়। প্রেম বিষয়ে দু একটি গানের নমুনা দেওয়া হচ্ছে।

"ন্নান ন হাঁকে ছপ্পর চোঁ নিকানী,
খুলফে দীল ওয়াগী..."

পুকুর থেকে স্নান করে উঠে আসছে, মনে হচ্ছে যেন হুক্কার চিলম থেকে আগুন বেরুচ্ছে!

"বৈরে বৈরে বৈরে
থেরে ও রেরে প্যার দিয়াঁ গানাঁ
হোঁ সন্তাঁ দে ডেরে..."

গ্রামের সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমাদের প্রেমের বিষয় খুব চর্চা হচ্ছে।

এ ছাড়া মেয়েদের 'গিদ্দা' নাচ আছে। মেয়েরা ঢোলক নিয়ে নাচে। ঢিমে তালে আরম্ভ হয়। তারপর ক্রমশঃ দ্রুততর হতে থাকে। এর সংগে যে গান গাওয়া হয় তার মানে "গিদ্দা নৃত্য, তুমি আমাদের গ্রামেও এস। গ্রামের বাইরে পথ দিয়ে চলে যেও না"।

মেয়েদের আর এক রকম নাচ আছে তার নাম 'লুড্ডী' নৃত্য। পুরুষরাও ঐ নাচ নাচে। এটা পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বেশী দেখা যায়।

এ ছাড়া পাঞ্জাবের সব জায়গাতে ঝুমর নাচ আছে। এক রকম ঝুমর তাতে মেয়ে-পুরুষ এক সংগে নাচে। এ নাচ চাঁদনী রাতে নাচা হয় এবং এর ছন্দ খুব মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। মণিপুরের রাসলীলায় কুমারী মেয়েরা নাচে কিন্তু পাঞ্জাবের ঝুমরে বিবাহিতা রমণী ছাড়া আর কাউকে নেওয়া হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন রকমের নাচ হয়; সুতরাং উপরে যে কয় রকম লোক-নৃত্যের কথা বলা হোল তা ছাড়া আরও কয়েক রকম নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নৃত্য :

আমাদের ভারতে এছাড়া ছড়িয়ে আছে আরও অনেক রকমের নৃত্য। যেমন, আসামের 'বিহুনৃত্য'। এটি আসামের জাতীয় নৃত্য। তারপর নাগাদের শিকার-নৃত্য। মহিষের শিং আর পালকের মুকুট পরে



গুজরাটের গরবানৃত্য

হাতে বর্শা নিয়ে শিকারীর বেশে নাগাদের এই নৃত্য বড় সুন্দর, বড় আনন্দদায়ক।

উত্তর প্রদেশের কথকনৃত্য, ঝোরানৃত্য, ঝাপেলী

ও জগরনৃত্য ভারতের এক-একটি সম্পদ। এবার বলি, রাজস্থানের ঝুমুরনৃত্যের কথা। হোলী বা দেওয়ালী উৎসবে ঝুমুরের তালে তালে মেয়েরা রঙ্-বেরঙের শাড়ি পরে যখন নৈবেদ্যের থালা হাতে মন্দিরের দিকে যায়, সে দৃশ্য যে দেখেছে, সে কখনও তা ভুলতে পারে না। তার উপর মেয়েদের গুন্‌গুনিয়ে প্রাণ-মাতানো গান—বড় চমৎকার! তাছাড়া গুজরাটের গরবানৃত্য, কর্ণাটকের যক্ষগণ নৃত্য, মাদ্রাজের কুর-ভালজি নৃত্য, উড়িষ্যা ও বিহারের চৌনৃত্য, জম্মু ও কাশ্মীরের ডোগরা নৃত্য ইত্যাদি বেশ নামকরা ও লোকপ্রিয়।

সাঁওতালী-নৃত্য ঃ

সংস্কৃতির দিক থেকে সাঁওতালী বা অন্যান্য উপজাতীয়দের নাচের গুরুত্ব কম নয়। তারা শাল-মহুয়ার দেশে থাকে। তাদের মাদলের ধিতাং ধিতাং বোলে থাকে পাহাড়ী নদীর ছন্দ, বাঁশীর সুরে থাকে অরণ্যের ভাষা। সেই ভাষা ও সুরের মূর্চ্ছনায় তারা সবাইকে ডাক দেয়। সেই ডাকে কোন সাঁওতাল সাড়া না দিয়ে পারে না। প্রতি শুক্লপক্ষে সন্ধ্যা হলেই সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা যেখানে বরাবর তাদের নাচের

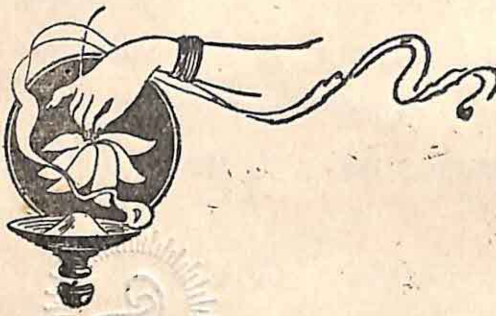


অপূর্ব এক নাচের ভঙ্গিমায় মেতে উঠেছে মধ্যপ্রদেশের উপজাতি মেয়ে ও পুরুষ

উৎসব হয় সেখানে এক সংগে মিলে। সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা ফুল দিয়ে সেজে নাচের আসরে উপস্থিত হয়। জংলী হলেও তাদের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। তাদের জগ্‌মাঝি অর্থাৎ সর্দারের সহকারী এই নাচের সময় হাজির থাকে। কোন ছেলে কোন মেয়ের সংগে খারাপ ব্যবহার করলে তাকে নাচের জায়গা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু নেই।

সাঁওতালী নাচ মোটামুটি তিন রকমের—সামাজিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় ও শিকারের। 'দং', 'লাগড়ে', ও 'ঝিকা', তাদের প্রধান সামাজিক নৃত্য। এ ছাড়া 'সহরায়', 'লবয়', ও 'ডাহার' নৃত্য আছে। 'মারমঁড়ে' 'বাহা' ও 'কারাম' তাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় নৃত্য। 'ডুষেগড়' সাঁওতালদের শিকার ও রণ নৃত্য। সাঁওতালদের প্রাণ খোলা নৃত্য না দেখলে তার সৌন্দর্য বোঝানো যায় না। নাচের মধ্যে মেয়েরা তাদের মনের কথা জানাচ্ছে, ছেলেরাও সেই মতো উত্তর দিচ্ছে। এই নাচই তাদের জীবন ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ভারতের সাহিত্য



"পুরাতন যে-ভারতের আদর্শ আধুনিককালের ভারতবাসীদের মনে অনেকদিন থেকে ফুটে উঠেছে সেই হচ্চে প্রধানত ধর্মশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, দর্শনশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, জপতপঃক্লিষ্ট ভারতবর্ষ।……আমাদের ইতিহাসে জাতীয় চিত্তের সজীবতার নিদর্শন যতই পাব ততই আমরা বুঝব জীবনের ধর্ম কি, তার প্রকাশ কিরূপ…"

—রবীন্দ্রনাথ

সংস্কৃতি ও সাহিত্য ঃ

সংস্কৃতির প্রধান বাহন অর্থাৎ ধারক ও বাহক সাহিত্য। যুগে যুগে নানাজাতির সংমিশ্রণের ফলে ভারতে যে সব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাদের নিদর্শন পাওয়া যাবে তার সাহিত্যে। জগৎ পরিবর্তনশীল, সুতরাং সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ছবি সাহিত্যে ফুটে উঠে।

ভারতের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে ধর্মের সংগে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই আমাদের দেশে ধর্মকে নিয়েই সংস্কৃতির বাহক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। ধর্মই ছিল সাহিত্যের প্রাণ। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতি ছিল একটি অন্তরের জিনিস। লেখাপড়ার সংগে তার সে রকম সম্বন্ধ ছিল না, নিরক্ষরেরও সংস্কৃতি ছিল। শুধু সাহিত্য নয়, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সকল বিদ্যাই ধর্মের অংগ ছিল, এমনকি শিল্পকলাও ছিল ধর্মের বাহন। তাই শিল্পবিদ্যার গ্রন্থকেও বলা হত শাস্ত্র। যা সকলকে ধারণ করে তাই ধর্ম। সুতরাং ভারতে ধর্ম ছাড়া কোন কাব্য লেখা হয়নি, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিকাশ হয়নি, চিত্র, নৃত্য বা সংগীত-কলাও তৈরি হয়নি।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ঃ

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার। সেই সময় গড়ে উঠেছিল আর্যদের বৈদিক সভ্যতা ও সাহিত্য। তারও এক হাজার বছর আগেকার সিন্ধু-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায়। কিন্তু সেখানে অন্য সংস্কৃতির নিদর্শন মিললেও, উৎসব ইত্যাদির কথা জানা গেলেও, সাহিত্যের কথা বিশেষ জানা যায়নি।

সৃষ্টির কথা চিন্তা করতে করতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার চার মুখ থেকে যা বেরিয়েছিল তা জানতে পেরেছিলেন ধ্যানস্থ ঋষিগণ। তাই তার নাম 'বেদ' অর্থাৎ যা জানা গিয়েছিল। ঋষিরা ধ্যানযোগে শুনতেন বলে এর অপর নাম 'শ্রুতি'।

ঈশ্বরের বাণী বলে বেদ 'অপৌরষেয়' অর্থাৎ কোন মানুষের তৈরি নয়। সমগ্র বেদ এককালে তৈরি হয়নি। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আর্যরা যে মানসিক উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ফল প্রতিফলিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে।

বেদ চারটি। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য বললে আরো কয়েকটি জিনিস বুঝায়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্র-সাহিত্য ও অন্য 'বেদাংগ'।

বেদ ঃ

দেবতাদের স্তব বা মন্ত্র নিয়ে বেদ। চার বেদের এই মন্ত্র অংশ নিয়ে চারটি সংহিতা তৈরি হয়েছিল—ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। দেবতাদের স্তুতি-বন্দনা নিয়ে ঋক্‌বেদ-সংহিতা। আর্য-ঋষিরা যে যাগ-যজ্ঞ করতেন তার পদ্ধতির মন্ত্র নিয়ে হয় যজুর্বেদ। ঋকের যে স্তবগুলি যজ্ঞের সময় গান করা হত তাই নিয়ে হয় সামবেদ। আর রোগ, ভূত-প্রেত, দানব ও হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে তৈরি হয় অথর্ব বেদ।

ব্রাহ্মণ ঃ

চার বেদের চার ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের ও রাজাদের অভিষেকের নিয়ম ও বৈদিক-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এ সব বিবরণ বা ব্যাখ্যা গদ্যে লেখা।

আরণ্যক ও উপনিষদ ঃ

বৈদিক রীতি অনুসারে যাঁরা বার্ধক্যে অরণ্যে বাস করতেন এবং সেজন্য যাগ-যজ্ঞ করার সুযোগ পেতেন না তাঁদের মানসিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য এই আরণ্যক তৈরি হয়েছিল। আরণ্যকে স্বাধীন

চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। এই আরণ্যকের সারভাগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল উপনিষদ। এরমধ্যে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের বদলে দার্শনিক চিন্তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের শেষ (অন্ত) ভাগ বলে ওকে 'বেদান্ত'ও বলে। আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদে যে উচ্চ দার্শনিক চিন্তাধারা আছে তাকে আজও হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ উৎস বলে গণ্য করা হয়। কর্ম, মায়া, মুক্তি আত্মজ্ঞান লাভের উপায় প্রভৃতি হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণা সবই উপনিষদে পাওয়া যায়।

যতদূর জানা গেছে, অন্ততঃ ১০৮ রকমের উপনিষদ তখনকার দিনে চালু ছিল। এরমধ্যে ১০ খানা ঋগ্বেদের, ৫১ খানি যজুর্বেদের, ১৬ খানি সামবেদের এবং ৩১ খানি অথর্ববেদের। আজকাল যেসব উপনিষদ প্রচলিত তাদের অধিকাংশই অথর্ববেদের সংগে সংশ্লিষ্ট।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের বড় ছেলে দারার উদ্যোগে ৫০ খানি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ হয়। আবার এর থেকে ১৮০১-০২ সালে ঐ উপনিষদগুলির বিদেশী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়। জার্মানদেশে এক বড় দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এই ল্যাটিন অনুবাদ পড়ে মোহিত হয়ে বলেছিলেন, 'সারা

পৃথিবীতে এই উপনিষদের মতো সুন্দর ও জ্ঞানবান পুস্তক আর নেই ; এ আমার জীবনের আনন্দ, মরণের সান্ত্বনা।' জার্মানদেশের আর এক পণ্ডিত বেবার অথর্ববেদের উপনিষদগুলিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগের নাম বেদান্ত উপনিষদ। এতে বেদান্ত আর ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম যোগ উপনিষদ। এতে ওঁকার আর যোগতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় ভাগের নাম হল সন্ন্যাস-উপনিষদ—এতে চতুর্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ভাগকে সাম্প্রদায়িক উপনিষদ বলা হয়—এতে আবার দুটি ভাগ আছে। একটির নাম শৈব-উপনিষদ। এসব উপনিষদে শিব-পরমাত্মার স্থান অধিকার করেছেন। অপরটি হল বৈষ্ণব-উপনিষদ—এতে বিষ্ণু-পরমাত্মার স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কোন কোন অবতারের বর্ণনাও এতে দেখতে পাওয়া যায়। এই সাম্প্রদায়িক উপনিষদ যে বহু পরের লেখা এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কোষিতকী এই বারোটি উপনিষদ যে খুব প্রাচীন তাতে কারও সন্দেহ নেই।

সূত্র-সাহিত্য ঃ

ইহলৌকিক ব্যাপারে হিন্দু-সমাজের ভিত্তি বলা যেতে পারে সূত্র-শাস্ত্রকে। এর মধ্যে 'গৃহ্য-সূত্র'ই প্রধান, কারণ এতে হিন্দু-গৃহীর পালনীয়, আচরণীয় সব কাজই নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। মায়ের জঠর থেকে জন্ম, নামকরণ, পৈতে, বিয়ে, মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে কর্তব্যকর্ম, আচার-উৎসব সূত্রকারেরা সব বেঁধে দিয়ে গেছেন। হিন্দু-গৃহীর ধর্ম ও করণীয় কি—তা হল গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয়। হিন্দুর জীবন শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এই চার আশ্রমে ভাগ করা আছে। এই চার আশ্রমের জন্য কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এভাবে পারিবারিক জীবনের সংগে সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই সূত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে পরে আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বেদাংগ ঃ

বেদপাঠ ও যজ্ঞ ইত্যাদি কিভাবে করতে হবে তা শিক্ষা করার জন্য যে ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন তাকে বলে বেদাংগ। যেমন—(১) শিক্ষা (২) ছন্দ (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত (৫) জ্যোতিষ ও (৬) কল্প।

(১) 'শিক্ষা' থেকে বেদের বর্ণগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানতে পারা যায়। (২) 'ছন্দ' থেকে বৈদিক স্তোত্র-গুলির ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। (৩) 'ব্যাকরণ' পড়ে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করার নিয়ম জানতে পারা যায়। (৪) 'নিরুক্ত' (যাস্ক প্রভৃতির লেখা) পড়লে শব্দের উৎপত্তি জানতে পারা যায়। (৫) 'জ্যোতিষ' শাস্ত্র পড়লে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির খবর জানা যায়। (৬) 'কল্প' সূত্রে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পালনীয় কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূত্র তিন অংশে ভাগ করা আছে—শ্রৌতসূত্র, গৌতম, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতির লেখা অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিয়মগুলির সংকলন। গৃহ্যসূত্র—কাত্যায়ন, গোভিল প্রভৃতির লেখা। এতে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্য, নামকরণ, পৈতে, বিয়ে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মসূত্র—এতে বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম-কানুন বেঁধে দেওয়া আছে। এই ধর্মসূত্র অবলম্বন করে পরবর্তীকালে 'স্মৃতি-শাস্ত্র' তৈরি হয়েছিল। যেমন—মনুসংহিতা, অত্রি-সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি ১৮ খানি ধর্মশাস্ত্র।

ষড়দর্শন ঃ

উপনিষদে যে সব উচ্চ চিন্তা ও তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে তার ব্যাখ্যা থেকেই হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি। হিন্দুদর্শন ছয় রকম ঃ—(১) কপিলের সাংখ্যদর্শন (২) পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র (৩) গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র (৪) কণাদের বৈশেষিক দর্শন (৫) জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও (৬) বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত।

বেদের সংকলন ঃ

বেদের জ্ঞান মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু চিরদিন তা চলে না। তাই সবগুলি বেদ সংগ্রহ করে সংকলন করলেন মহামুনি "কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন"। চার বেদের ব্যাস অর্থাৎ সংকলন বা ভাগ করার জন্য তাঁর নাম হলো বেদব্যাস। বেদব্যাসের এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত। এই বেদব্যাসই মহাভারত লিখেছিলেন, সেই কথা এবার বলা হচ্ছে।

প্রাচীন মহাকাব্য ঃ

রামায়ণ ও মহাভারতে—বৈদিক সাহিত্যে বীরত্বের গাথা এবং রাজা ও ঋষিদের সম্বন্ধেও অনেক উপাখ্যান

পাওয়া যায়। বড় বড় রাজারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। তাতে বীণার সংগে বীরদের 'গুণগাথা ও আখ্যান' গাওয়া হত। কালে এইসব গাথা ও উপাখ্যান নানাভাবে বাড়িয়ে মহাকাব্যে পরিণত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীনকালের মহাকাব্য। সংস্কৃতে রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি মুনি ও মহাভারত রচনা করেন মহামুনি বেদব্যাস। কিন্তু এই দুটি মহাকাব্য কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একজনের লেখা মনে হয় না। অনেক সময় ধরে অনেক লোক যা সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন এই মহাকাব্য দুটি তার সংকলন বলে মনে হয়।

রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও অন্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আর্য সভ্যতার বিস্তার এবং আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে হিন্দু সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ছবি এই দুই প্রাচীন মহাকাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এদের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলে গিয়েছেন, "রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র। ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।

ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।”

যুগ যুগ ধরে এই দুই মহাকাব্য ভারতবাসীর ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে পড়া হয়ে আসছে; তার কারণ, এ দুটির মধ্যে এমন কতকগুলি চরিত্র আঁকা আছে যা ভারতীয় সমাজে চিরকাল আদর্শরূপে আদর পেয়ে আসছে। রামায়ণে স্বয়ং ভগবানরূপে পূজিত রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের স্বার্থত্যাগ ও মহানুভবতা, সীতার পতিভক্তি প্রভৃতি এবং মহাভারতে ভীষ্মের সত্যপালন, যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা, বিদুরের সন্তোষ প্রভৃতি ভারতবাসীর সামনে অপূর্ব মহান আদর্শ তুলে ধরেছে। শুধু তাই নয়, এ দুটি মহাকাব্য ঋষিদের জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি, ত্যাগ ও উদারতা প্রভৃতি আনন্দ ও জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে আছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ‘গীতা’ আমাদিগকে জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মযোগ শিখাইয়াছে।

রামায়ণ হতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, প্রথম আর্য সভ্যতার কেন্দ্রের সীমা ছিল গঙ্গার উপত্যকার মধ্যে, দুঃসাহসিক অভিযান দ্বারা বড় বড় পর্বত ও অরণ্য পার হয়ে মধ্যদেশ হ’তে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে

আর্য সভ্যতা ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাভারতে কিন্তু অন্যরকম কথা। মহাভারতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বড় বড় রাজা ও রাজ্যের কথা আছে। এঁরা সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেমেছিলেন। ভারতের সকল নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থানের কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতের কেন্দ্র-চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের বাড়ি কাথিয়াবাড় উপকূলে দ্বারকায়। এসব থেকে বেশ বোঝা যায় যে, রামায়ণ আর্য সভ্যতার আদি-পর্বের ছবি আর মহাভারত আর্য-অনার্যের মিশ্রণে গড়ে ওঠা পরবর্তী হিন্দু সভ্যতার কাহিনী। এই দুই মহাকাব্যের ভৌগোলিক অবস্থানের বিচার ছাড়াও সমাজের যে ছবি আছে তা থেকেও এই আগে-পরের কথা বেশ বোঝা যায়। রামায়ণের রাম আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃত্যুর জন্য তপস্যারত শূদ্র শম্বুকের প্রাণ নিয়ে রাজকর্তব্য পালন করেন। কিন্তু মহাভারতে এই বিশুদ্ধ আর্যত্ববোধ নেই। বনপর্বে সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, অনিষ্ঠুরতা, ক্ষমা, দয়া, দান ও তপস্যা আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। নহুষ পুনরায় প্রশ্ন করায় যুধিষ্ঠির পরিষ্কার বললেন, ব্রাহ্মণের গুণ যদি শূদ্রে দেখা যায় তবে সে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলতে

হবে। এতে ব্রাহ্মণোচিত কাজে অবহেলার জন্য ব্রাহ্মণকে সাবধান করে দেওয়ার সংগে সমাজের মধ্যে ক্রমে যে বর্ণ-বৈষম্য জন্য অসন্তোষ ও অভিযোগ মাথা তুলতে শুরু করেছিল সে বিষয়েও সকলকে সচেতন ক'রে দেওয়া হয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধসাহিত্য :

বেদের ধর্ম ক্রমে সহজ, সরল না থেকে জটিল এবং মানুষের জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। ধর্মের নামে জীব হিংসা এবং নিম্ন শ্রেণীর প্রতি উচ্চ-শ্রেণীর ঘৃণা দেখানোর ফলে বিরোধী আন্দোলন শুরু হল ; বেদের প্রাধান্য খর্ব ক'রে নতুন নতুন ধর্মপ্রচার হতে লাগল।

বৈদিক ধর্মের প্রতি অসন্তোষ ও উপেক্ষা কোন কোন উপনিষদেই দেখা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে 'পরা' বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং 'অপরা' বা নিকৃষ্ট বিদ্যা—এই দু'রকম বিদ্যার কথা আছে। ছয়টি বেদাংগকে নিকৃষ্ট বিদ্যা বলা হয়েছে। ঐ উপনিষদে এ কথাও বলা হয়েছে যে যাগ-যজ্ঞ রূপ 'ভেলা' তেমন দৃঢ় নয়, ভর সহে না ; সুতরাং ওর উপর নির্ভর করা চলে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একদল দার্শনিকের কথা আছে, যাঁরা

পঞ্চভূতকেই পরমতত্ত্ব মনে করতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেহ-বাদী বিরোচনের কথা আছে। এ সব বেদ-বিরোধীদের বলা হত 'লোকায়ত,' 'নাস্তিক' বা 'চার্বাক'। কেউ কেউ বলেন, চার্বাক বলে কোন ঋষি ছিলেন না, যাঁরা 'চারুবাক' তাঁরাই চার্বাক। এ থেকে মনে হয় যে তাঁদের জীবনদর্শন সাধারণ জন-সমাজে বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এ সময় বর্তমান বিহার প্রদেশের মজঃফরপুর জেলায় লিচ্ছবীরা বাস করতেন; তাঁদের রাজধানী ছিল পাটনা থেকে ২৭।২৮ মাইল দূরে বৈশালী শহরে। এই লিচ্ছবী বংশে বর্ধমান মহাবীর জন্মেছিলেন; ইনি যে ধর্ম প্রবর্তন করেন তার নাম হয় তাঁর 'জিন' উপাধি থেকে 'জৈন'। এই লিচ্ছবীদের সংগে শাক্যদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেই শাক্য বংশে জন্মান গৌতম, যিনি পরে বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করেন।

জৈনধর্ম সাহিত্য ঃ

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ দুই ভাগে ভাগ করা আছে—'পূর্ব ও অংগ'। 'পূর্ব'—১৪টি, যাতে মহাবীরের মূল ধর্মের উপদেশগুলি আছে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের বল্লভীতে যে ধর্মসভা হয়েছিল তাতে জৈন ধর্মগ্রন্থ

সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এগুলি 'অংগ', 'উপাংগ', 'প্রবরণ' ও 'মূল-সূত্রে' বিভক্ত—অংগ ১১টি, উপাংগ ১২টি, প্রকরণ ১০টি এবং মূল সূত্র ৪টি। গ্রন্থ অর্ধ মাগধী প্রাকৃত ভাষায় লেখা; এ ভাষাকে জৈন-প্রাকৃত বা জৈন মহারাষ্ট্রিক ভাষাও বলা হয়।

মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক বুদ্ধের উপদেশগুলি এবং তাঁর ধর্মের নীতিগুলি সংকলনের জন্য রাজগৃহে এক ধর্মসভা হয়। এই সভার নাম প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্গীতি। এই সঙ্গীতি বৌদ্ধধর্ম নীতিগুলিকে তিনটি পিটকে (ঝুড়ি) ভাগ করা হয়; এ জন্য এগুলিকে বলে ত্রিপিটক—সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক। সূত্রপিটকে বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম-আলোচনার কথা আছে; এর পাঁচটি 'নিকায়' বা ভাগ আছে। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় ও নিয়মকানুন আছে। অভিধর্ম পিটকে প্রধানতঃ বৌদ্ধ দর্শনের কথা আছে। পরে মহাযানী বৌদ্ধরা আরও অনেক নতুন বৌদ্ধ শাস্ত্র তৈরি করেন, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র' (পারমিতা—চরম গুণ)। এ ছাড়া নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক' এবং অসংগ ও বসুবন্ধুর 'যোগাচার-দর্শন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও কতকগুলি সরস কাব্য-সাহিত্য আছে, যেমন—'ললিত-

বিস্তর', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', শান্তি দেবের 'বোধিচর্যাবতার'। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য নানা ভাষায় পাওয়া গিয়েছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বোজে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় এবং তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায়। তিব্বতী, চীনা ও মোঙ্গলীয় ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে।

মৌর্য এবং বিদেশী অভিযান-যুগের সাহিত্য ঃ

প্রথমেই বিখ্যাত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা বলি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ (কৌটিল্য) চাণক্যের অর্থশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী এর বিষয়বস্তু পনের খণ্ডে ও একশ'র বেশী অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। কৌটিল্যের গ্রন্থে বৃহস্পতি, উশনস্, বিশালাক্ষ প্রভৃতি প্রাচীন অর্থশাস্ত্র প্রণেতার উল্লেখ আছে।

মৌর্য সম্রাটদের সময় এবং পরে কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রমাণ। এখানে সাহিত্য ও অন্য নানা বিষয়ের উচ্চাঙ্গের চর্চা হত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের বাইরের

দেশ হতেও নানা বিদ্যা শিক্ষা ও চর্চার জন্য হাজার হাজার অধ্যাপক ও ছাত্রের সমাগম হত। চরক চিকিৎসা-বিদ্যা সক্রান্ত এবং সুশ্রুত শল্য চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত সংহিতা এই সময় রচনা করেন। প্রবাদ আছে যে চরক ছিলেন মহারাজ কণিষ্কের চিকিৎসক। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শলাতুর গ্রামের অধিবাসী পাণিনি তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। এটিই সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। তার অনেক পরে কাত্যায়ন এই অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা ক'রে 'বার্তিক' রচনা করেন। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২য় শতকে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পাণিনি ও কাত্যায়ণের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও সংশোধন করে তাঁর বিখ্যাত 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। 'ভাস' কবির তেরখানি নাটকও এ সময়ের লেখা মনে হয়। অবশ্য সময় নিয়ে মতভেদ আছে। তেরখানি নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা', 'প্রতিমা', 'অভিষেক', 'বালচরিত' প্রভৃতি। এর মধ্যে বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন অবলম্বনে লেখা 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'ই শ্রেষ্ঠ।

উপরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা গ্রন্থের কথা বলা হল।

ঐ যুগের প্রাকৃত ভাষায় লেখকদের মধ্যে অন্ধ্রদেশের গুণাঢ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ। তিনি পৈশাচী ভাষায় তাঁর 'বৃহৎকথা' নামে কাহিনীগ্রন্থ রচনা করেন। এতে অনেক চিত্তাকর্ষক গল্পের সমাবেশ আছে। পরবর্তী কালে ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব 'বৃহৎকথার' সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

মহারাজ কণিষ্কের সভাসদ অশ্বঘোষ একাধারে ছিলেন কবি, দার্শনিক ও নাট্যকার। তাঁর লেখা 'বুদ্ধ-চরিতে'র কথা আগে বলা হয়েছে। এটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এক অমূল্য নাটক। বাংলা ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। তাঁর আর একখানি নাটক সারিপুত্রকপ্রকরণ-এ সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নকে বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার বিষয় দেখানো এবং কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' সূত্রের কথা বলা হয়েছে। তাকে অবলম্বন করে কণিষ্কের সময় বিদর্ভের নাগার্জুন তাঁর 'মাধ্যমিক' বা 'মধ্যম-কারিকা' রচনা করেন। তিনি 'সুহৃল্লেখা' নামে আর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। এটি বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র চিঠির আকারে লেখা।

তৃতীয় শতকে আর্যদেব 'চতুঃশতিকা' নামের গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার নিয়ম তীব্রভাবে সমালোচনা

করেন। চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ লেখক অসংগ 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' নামের গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতক অথবা কণিষ্কের আমল থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্যরা দলে দলে চীন দেশে গিয়ে চীনা পণ্ডিতদের সাহায্যে বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যেই সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতী ও মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চীনা পরিব্রাজক এবং পণ্ডিতেরাও ভারতবর্ষে আসেন। ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য যাঁরা চীন দেশে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ধর্মরত্ন' ও 'কাশ্যপমাতঙ্গ' এ দু'জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনা পরিব্রাজক ও পণ্ডিতদের মধ্যে ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতক), হিউয়েন সাং (সপ্তম শতক), আই সিঙ ভারতে এসে যে সব বিবরণ লিখে গেছেন সেগুলি নানা দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

গুপ্তযুগ অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ ঃ

গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। পাণিনির পর থেকে পাঁচশ' বছর ধরে সংস্কৃত

ভাষা ও সাহিত্য ক্রমবিকাশের ফলে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। গুপ্ত সম্রাটরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; সমুদ্র গুপ্ত শুধু দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, ভাল কবিও ছিলেন; তাই তাঁর উপাধি ছিল কবিরাজ। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'র লেখক হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের সভায় একজন বড় কবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনও কবি ছিলেন। এই সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়েছিলেন। এঁর সভায় সেকালের ন'জন বড় পণ্ডিত ছিলেন—তাঁদের বলা হত 'নবরত্ন'। এই নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন কবিকুল তিলক কালিদাস। শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ অগ্নিমিত্রের সংগে মালবিকার প্রেম-কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। তাঁর দ্বিতীয় নাটক (ত্রোটক) 'বিক্রমোর্বশী' ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র অবলম্বনে লেখা। এতে আছে রাজা পুরূরবা ও অপ্সরা উর্বশীর অপূর্ব প্রণয়ের কথা। কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'শকুন্তলা'। এর বিষয়বস্তু পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া। মহারাজ দুষ্মন্তের সংগে তপোবনবালা শকুন্তলার বিবাহ, বিচ্ছেদ ও পুনরায় মিলন নিয়ে কি অপরূপ সাহিত্যই না সৃষ্টি করে গেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরতই ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা রাজচক্রবর্তী। এই

নাটক সম্বন্ধে ইউরোপের কবিকুলের গুরু গ্যেটে সাহেব লিখেছিলেন—'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, যাহা কিছু আত্মাকে আকৃষ্ট করে, বিমোহিত করে, তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি করে এবং তাহাকে পরিপুষ্ট করে তাহা এবং যদি স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র দেখিতে চাও তবে তাহা একমাত্র শকুন্তলা নাটকে পাইবে।'

এ ছাড়া কালিদাসের কাব্যসৃষ্টিও অতুলনীয়। সূর্যবংশ ও শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ-বিজয় অবলম্বনে 'রঘুবংশ', অভিশাপে নির্বাসিত বিরহী যক্ষ কর্তৃক প্রিয়ার নিকট দূতরূপে মেঘ প্রেরণের অপূর্ব কল্পনায় ভরা 'মেঘদূত', তপস্বী হরের সংগে তপস্যারতা পার্বতী উমার মিলন ও কার্তিকেয়ের জন্ম নিয়ে লেখা 'কুমারসম্ভব', ঋতু কয়টির অতি সরস হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা নিয়ে 'ঋতু সংহার' প্রভৃতি ছোট বড় কাব্য ভারতের স্বর্ণযুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে অমর করে রেখেছে।

কালিদাস ছাড়া আরও অনেকে কাব্য ও নাটক সৃষ্টি করেছিলেন এ যুগে বা ঠিক এর আগে বা পরে। কালিদাসের আগে ভাস কবির তেরটি নাটকের কথা বলা হয়েছে। রাজা শূদ্রকের লেখা সামাজিক নাটক 'মৃচ্ছকটিক' (ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রণয়

কাহিনী) কালিদাসের আগের রচনা। তাঁর পরের রচনা কান্যকুব্জের রাজা শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়-দর্শিকা' নাটিকা এবং 'নাগানন্দ' নাটক। রত্নাবলীতে সিংহলের রাজপুত্রী রত্নাবলীর সংগে রাজা উদয়নের এবং প্রিয়দর্শিকাতে রাজা দৃধবর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার সংগে ঐ উদয়নের মিলন কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য বেশ দেখা যায়। এ দুটি নাটকে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। মহেন্দ্র বিক্রমের 'মত্তবিলাস' প্রহসন ও সমসাময়িক সামাজিক অবনতির জ্বলন্ত চিত্র।

কালিদাসের পর যে মহাকবির রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছিল, তাঁর নাম ভবভূতি। তাঁর প্রথম নাটক 'মহাবীরচরিত' রামায়ণ অবলম্বনে লেখা হলেও তাতে নতুন কথার অবতারণা আছে। পরের নাটক (প্রকরণ) 'মালতীমাধব', মাধব ও মালতীর প্রেম-কাহিনী। এই নাটকের ভূমিকা পড়লে বোঝা যায় তাঁর লেখা তেমন সমাদর পায়নি। তিনি সেখানে বলেছেন, "আমার কাব্যের ভাব বুঝতে পারবেন এমন ব্যক্তি একদিন জন্মাবেন অথবা হয়তো এখনও কোথায় আছেন, কারণ কালের অবধি নেই এবং পৃথিবীর সীমা বহু বিস্তৃত।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর তৃতীয় নাটক 'উত্তর-রামচরিতে' সার্থক হয়েছে।

সীতার বনবাস ও তাঁর চিরবিদায় অবলম্বনে এ এক অপূর্ব কাহিনী। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র সংগে তুলনা করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন, 'একটি উদ্যানের গোলাপ, আর একটি বনমালতী। একটি ব্যঞ্জন, অপরটি হবিষ্যান্ন। একটি বসন্ত, অপরটি বর্ষা। একটি নৃত্য, অপরটি অশ্রু। একটি উপভোগ, অপরটি পূজা।......বহু শতাব্দী পূর্বে কবিদ্বয় যে নারীচরিত্রের বর্ণনা বা কল্পনা করিয়াছেন সেই শকুন্তলা, সেই সীতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন।......এক সংগে এত ব্রীড়ানম্রা, এত সুন্দরী, এত পবিত্রা, এত মুগ্ধা, এত কোমলহৃদয়া, এত অভিমানিনী, এত নিঃস্বার্থ প্রেমিকা, এত সহিষ্ণু— এ রমণীদ্বয় আমাদেরই, আর কাহারও নয়। ধন্য কালিদাস। ধন্য ভবভূতি।"

মহারাজ শ্রীহর্ষের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সভাকবি ভট্টনারায়ণ মহাভারত অবলম্বনে 'বেণীসংহার' নাটক লিখেছিলেন। দুঃশাসন বধের পর ভীম কর্তৃক রক্তাক্ত হস্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন হতেই এই নাটকের নামকরণ। অবশ্য, এতে দুর্যোধন বধ ইত্যাদিও আছে। নয় শতকে মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' ভবভূতির পর রাম

চরিত নিয়ে লেখা প্রথম নাটক। কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্র পালের শিক্ষক রাজশেখরও রামচরিত অবলম্বনে 'বাল রামায়ণ' এবং মহাভারত অবলম্বনে 'বাল ভারত' লিখেছিলেন। এটি অসম্পূর্ণ, তাঁর আর দু'খানি নাটকের নাম 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা' ও 'কর্পূর-মঞ্জরী'। শেষের খানি প্রাকৃতে লেখা। এগুলি দশ শতকের রচনা মনে হয়। দান-বীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও কোপন-স্বভাব ঋষি বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান অবলম্বনে 'চণ্ডকৌশিক' নাটক লিখে ক্ষেমীশ্বর কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্র পালকে দিয়েছিলেন। এগার শতকে দামোদর মিশ্র রামায়ণ অবলম্বনে 'মহানাটক' লিখেছিলেন, একে 'হনুমান নাটক'ও বলে। চৌদ্দ শতকে কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক লিখেছিলেন। এতে বিবেক, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্র দেখা যায়। আরও যে সব নাটক-নাটিকা লেখা হয়েছিল সেগুলি আগেরগুলির তুলনায় নানা দিক দিয়ে অনেক নিম্নস্তরের বিবেচনায় বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা হল না।

কাব্য ঃ

কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। 'সৌন্দরানন্দ'ও তার আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। কালিদাসের কাব্যগুলিরও

উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে মহাদেবের নিকট অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ নিয়ে লেখা কবি ভারবির ‘কিরাতার্জুনীয়’। রাবণ বধ অবলম্বনে ‘ভট্টিকাব্য’ এক অভিনব উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। সেটা হলো কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণ শেখানো। তিনি বলভীতে শ্রীধর সেনের সময় বাস করতেন ছয় বা সাত শতকে। রামায়ণ অবলম্বনে লেখা ‘জানকী হরণে’র রচয়িতা কুমার দাস প্রায় ঐ সময়ের লোক। আট শতকে মহাভারতের ‘শিশুপাল বধ’ নিয়ে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেছিলেন কবি মাঘ। শ্রীহর্ষের ‘নৈষধচরিত’ নিষধের রাজা নল ও দময়ন্তীর অপূর্ব কাহিনী বার শতকের লেখা বলে মনে হয়।

আরও কাব্য সাহিত্য : গীতিকাব্য (খণ্ডকাব্য) :

গীতিমধুর খণ্ডকাব্য সম্বন্ধে আগে কালিদাসের ‘মেঘদূত’ ও ‘ঋতুসংহার’এর কথা বলা হয়েছে। বেদান্ত দেশিকের লেখা ‘হংস-সন্দেশ’, রূপগোস্বামীর ‘হংসদূত’, কৃষ্ণদাসের ‘পদামৃত’ পরবর্তী যুগের (যথাক্রমে তের, পনর ও সতর দশকের) লেখাও সুপরিচিত। ঘটকর্পরের ‘ঘটকর্পর কাব্য’ মেঘদূতের অনুকরণে লেখা। শ্লোক সংখ্যা মাত্র বাইশ। এই ঘটকর্পর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। সাত শতকে লেখা ভর্তৃহরির

'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক' অতি সরস নীতি উপদেশপূর্ণ ভাষায় লেখা। প্রত্যেকটিতে ১০০টি শ্লোক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হলেও অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। অমরুর লেখা 'অমরুশতক' নারীর জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা। বাণভট্টের শ্বশুর ময়ূরের লেখা 'সূর্যশতক' একটি স্তবমালা। প্রবাদ এই স্তব রচনার ফলে সূর্যদেবের কৃপায় তিনি কুষ্ঠরোগ হতে মুক্ত হন। দুটি সাত শতকেরই মনে হয়। বার শতকে লেখা বিল্হনের 'চৌরপঞ্চাশিকা' প্রেয়সীর স্মৃতিতে ভরা পঞ্চাশটি শ্লোক। আঠার শতকে বাংলার কবি ভারতচন্দ্র যে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখে গেছেন তার মূল এই 'চৌরপঞ্চাশিকা'। বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় তাঁর সভাকবি বাঙ্গালী জয়দেব কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে গীতিকাব্য লিখে বাংলার সাহিত্য-জগতে অমর হয়ে আছেন। তাঁরই সমসাময়িক লক্ষ্মণসেনের অন্য সভাকবি ধোয়ী মেঘদূতের অনুকরণে 'পবনদূত' লিখেছিলেন।

গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঃ

গুপ্তযুগের অর্থাৎ ভারতের স্বর্ণযুগের একটি স্থায়ী কীর্তি হলো রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের সংস্কার,

নতুন করে তাদের সম্পাদন ও সংযোজন। এর আগে এদের যে রূপ ও আকৃতি ছিল তা অনেকটা পথহীন মহাবনের মতো। ভেতরে ঢুকলে বাইরে আসা যেত না, সামনে চলার পথ খুঁজে পাওয়া যেত না। শত শত কাহিনী, উপাখ্যান, ইতিবৃত্ত, রাজচরিত, নীতিকথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, কাব্যগাথা প্রভৃতির সংগে সাধারণ মানুষের নানা ধারণা, কল্পনা ও বিশ্বাস মিলে মিশে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ তৈরি হয়েছিল। এতদিন কেউ শ্রম ও ধৈর্যের সংগে এ সব উপাদান এক সূতায় গেঁথে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংগতি স্থাপনের চেষ্টা করেন নি। গুপ্তযুগের পণ্ডিতরা এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করে গেছেন। আজ আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যে রূপ দেখতে পাই, সে রূপ দিয়েছিল গুপ্তযুগের পণ্ডিতদের অসামান্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

গদ্য সাহিত্য ঃ

'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' এই দু'রকমের গদ্য সাহিত্য পাওয়া যায়। 'আখ্যায়িকা'তে কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, 'কথা'তে কাব্য রসই প্রধান। 'কাব্যাদর্শ' নামের অলংকার শাস্ত্র প্রণেতা দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত'

'রাজবাহন' প্রভৃতি রাজকুমারগণের কীর্তি অবলম্বনে লেখা আখ্যায়িকা। সুবন্ধুর লেখা 'বাসবদত্তা' রাজকুমার কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' যথাক্রমে কথা ও আখ্যায়িকা। 'কাদম্বরী' রাজকুমার চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনী। 'হর্ষচরিত' মহারাজ হর্ষের কীর্তি কাহিনী। প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকগুলি পালি ভাষায় লেখা সুন্দর উপদেশে ভরা ছোট ছোট গল্প। গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'বৃহৎকথা' বহু কথায় সমৃদ্ধ। এই পুস্তক অবলম্বনে লেখা তিনখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। বুধস্বামীর 'শ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎ সাগর'। এগুলি নয় শতক হতে একাদশ শতকের মধ্যে লেখা। সংস্কৃত কথাসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের পর বৃহৎ কথার স্থান। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও নারায়ণ পণ্ডিতের লেখা 'হিতোপদেশ' পশুপক্ষী অবলম্বনে লেখা মূল্যবান উপদেশে ভরা গল্প সঞ্চয়ন। শ্রীবরের 'কথাকৌতুক' এই জাতীয় পুস্তক। এটি পনের শতকে লেখা। 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা' এবং 'শুক-সপ্ততি' এই তিনটি গল্প-পুস্তকের লেখকের নাম আজ পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি।

চম্পূ :

গদ্যে ও পদ্যে লেখা 'চম্পূ' সাহিত্যের মধ্যে আর্য-শূরের 'জাতকমালা' প্রাচীনতম। ত্রিবিক্রম ভট্টের 'নলচম্পূ' ও 'মদালসাচম্পূ', দিগম্বর জৈন সোমদেবের 'যশতিলক', জৈন ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী', 'ভোজ-রাজের 'নারায়ণচম্পূ', অনন্তের 'ভারতচম্পূ', এবং জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' এই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এগুলি দশ শতক হতে ষোল শতক পর্যন্ত লেখা।

ইতিহাস :

প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। আট শতকে প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'গৌড়বহো' কনৌজের রাজা যশোবর্মন কর্তৃক রাজা গৌড়ের পরাজয়ের কাহিনী, লেখকের নাম 'বাক্‌পতি'। এগার শতকে পদ্মগুপ্তের লেখা 'নবসাহসাঙ্কচরিত' আঠার সর্গে মালবের সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্কের কথা এবং রাজকুমারী 'শশীপ্রভা' হরণের কাহিনী। ঐ শতকে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামপালচরিত' লেখেন, তাতে এক সংগে রামচরিত এবং বাংলার রাজা রামপালের কথা বর্ণিত আছে। বিল্‌হনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' আঠার সর্গে লেখা তাঁর

পৃষ্ঠপোষক মহারাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তি। ঐতিহাসিক সাহিত্যে কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতে রাজা হর্ষের মৃত্যুর পর থেকে কাশ্মীরের ইতিহাস সুন্দর পাওয়া যায়। বইখানিকে ঐতিহাসিক কাব্যও বলা যায়। বার শতকে হেমচন্দ্র চালুক্যরাজ কুমারপালের চরিত্র অবলম্বনে 'কুমারপালচরিত' লিখেছিলেন।

ব্যাকরণ ঃ

অতি প্রাচীন পাণিনির কথা আগেই বলা হয়েছে। সাত শতকে ভর্তৃহরি 'বাক্য পদীয়' ও 'প্রকীর্ণ' (পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকা) লিখেছিলেন। বামন ও জয়াদিত্য পাণিনির উপর 'কাশিকা' বৃত্তি লিখে গেছেন। বাঙালী বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'ন্যাস' বা 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা'—কাশিকা বৃত্তির উপর টীকা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর টীকা কৈয়টের 'প্রদীপ' এগার শতকের লেখা। পাণিনি অবলম্বনে লেখা আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। বার শতকে লেখা হরদত্তের 'পদমঞ্জরী', পনের শতকে লেখা রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়া কৌমুদী' এবং ষোল শতকে লেখা এই প্রক্রিয়া কৌমুদীর উপর টীকা বিট্ঠলাচার্যের 'প্রসাদ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সতের

শতকে ভট্টোজিদীক্ষিত পাণিনির সূত্রকে বিষয় অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করে তাঁর বিখ্যাত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' লেখেন। আঠার শতকে নাগেশ্বর ভট্ট কৈয়টের প্রদীপের উপর টীকা 'উদ্দ্যোত' 'বৃহৎচন্দ্রেন্দু-শেখর' এবং 'লঘুশব্দেন্দুশেখর' (সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উপর টীকা) এবং পরিভাষেন্দুশেখর' প্রকাশ করেন। বরদরাজের 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' ও 'মধ্য সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

ব্যাকরণে কয়েকটি শাখা প্রচলিত হয়েছিল। পাঁচ শতকে চন্দ্রগোমীর প্রবর্তিত 'চান্দ্র' শাখা পাণিনিকে ছোট করে শিক্ষার্থীদের সুবিধার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ শতকেই জৈনেন্দ্র ঐরূপ সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছিলেন। অভয় নন্দীর (আট শতক) গ্রন্থ এবং সোমদেবের 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা' জৈনেন্দ্র শাখার প্রকাশিত গ্রন্থ। শাকটায়ন শাখার প্রবর্তক শাকটায়ন নয় শতকে তাঁর 'শব্দানুশাসন' 'অমোঘবৃত্তি', 'পরিভাষ-সূত্র', 'গণপাঠ', 'ধাতুপাঠ', 'উনাদিসূত্র' এবং 'লিঙ্গানু-শাসন' প্রকাশ করেন। জৈন বৈয়াকরণিক, নিজ নামের শাখার প্রবর্তক হেমচন্দ্র এগার শতকে চার হাজার সূত্র নিয়ে তাঁর 'শব্দানুশাসন' প্রকাশ করেন। কাতন্ত

শাখার সর্ববর্মা 'কাতন্ত্রসূত্র' প্রকাশ করেন। একে কেউ কেউ 'কৌমার' ও 'কালাপো' বলেন। এ শাখাটি অতি প্রাচীন এবং বাংলা ও কাশ্মীরে বিশেষভাবে প্রচলিত। চৌদ্দ শতকে অনুভূতি স্বরূপাচার্য 'সারস্বত প্রক্রিয়া' লিখে সারস্বত শাখার প্রবর্তন করেন। বোপদেব তের শতকে তাঁর 'মুগ্ধবোধ' প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে ব্যবহৃত নামগুলি পাণিনির সূত্র থেকে ভিন্ন। মুগ্ধবোধের বিখ্যাত টীকাকার রাম তর্কবাগীশ বাংলা দেশে এই ব্যাকরণের প্রচলনের সহায়তা করেন। পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত 'সংক্ষিপ্তসার' ক্রমদীশ্বর কর্তৃক তের শতকে লেখা। জুমর নন্দী তাঁর 'রসবতী' নামে টীকায় এর অনেক উন্নতি করে গেছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে প্রবর্তিত শাখাকে জৌমর শাখা বলে। সৌপদ্ম শাখার প্রবর্তন হয় চৌদ্দ শতকে পদ্মনাভের 'সুপদ্ম' ব্যাকরণ থেকে। তিনি নিজেই এর 'সুপদ্ম-পঞ্জিকা' নামে টীকা লেখেন। ব্যাকরণের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দেওয়ার রীতি প্রথম লক্ষিত হয় বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে। রূপ গোস্বামীর 'হরিনামামৃত' কৃষ্ণ রাধা অবলম্বনে লেখা অপূর্ব ব্যাকরণ গ্রন্থ। 'চৈতন্যামৃত' আর একটি বৈষ্ণব ব্যাকরণ গ্রন্থ।

বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ঃ

গুপ্তযুগেই ভারতে বিজ্ঞানযুগের শুভ সূচনা হয়েছিল। গণিতশাস্ত্রে শূন্য-তত্ত্ব এ যুগের মহাবিষ্কার বলা চলে। ছয় শতকে বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' প্রকাশের আগে পাটলিপুত্রের আর্যভট্টই জ্যোতির্বিদ-গণের মধ্যে সর্বোচ্চ সমাদর পেতেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী তার আপন মেরুরেখার উপর ঘুরছে। তিনি দিনের যে সময় গণনা করেন তা প্রায় নির্ভুল ছিল। তিনি পাঁচ শতকে 'আর্যভট্টীয়' (দশটি শ্লোকে লেখা) 'দশগীতিকা সূত্র' এবং 'আর্যাষ্টশত' লিখেছিলেন। দশ শতকে আর একজন আর্যভট্ট তাঁর 'আর্যসিদ্ধান্ত' প্রকাশ করেন। ব্রহ্মগুপ্ত সাত শতকে 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ডখাদ্যক' প্রকাশ করেন। এর পরে লল্লের 'শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র' লেখেন এবং এগার শতকে ভোজের 'রাজমৃগাঙ্ক' এবং শতানন্দের 'ভাস্বতী' প্রকাশ হয়। বার শতকে ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' ও 'করণকুতূহল' প্রকাশিত হয়। এই 'সিদ্ধান্তশিরোমণির মধ্যে 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' অঙ্কশাস্ত্রে মূল্যবান্ গ্রন্থ। নয় শতকে মহাবীরাচার্য অঙ্কশাস্ত্রের উপর একটি সুন্দর গ্রন্থ লিখেছিলেন। ফলিত জ্যোতিষেও বহু গ্রন্থ রচিত

হয়েছিল। প্রাচীন পুঁথির মধ্যে 'বৃদ্ধ-গর্গসংহিতা'র কিয়দংশ পাওয়া গিয়েছে। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা', 'বৃহজ্জাতক' ও 'লঘুজাতক', তাঁর ছেলে পৃথুযশার 'হোরা শতপঞ্চাশিকা', ভট্টোৎপলের 'হোরাশাস্ত্র' এবং আরও অনেক পরে হর্ষকীর্তির 'জ্যোতিষ সারোদ্ধার' এবং নীলকণ্ঠের 'তাজিকা' দু'ভাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মশাস্ত্র ঃ

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে মনু প্রভৃতির সংহিতার কথা বলা হয়েছে। পরে ভবদেব ভট্টের 'সংস্কার পদ্ধতি' 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' প্রভৃতি (এগার শতক), লক্ষ্মীধরের 'স্মৃতিকল্পতরু' (বার শতক), হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' (বার শতক), জীমূতবাহনের 'ধর্মরত্ন' (বাংলার দায়-ভাগ), বিশ্বেশ্বরের 'মদনপারিজাত', চন্দ্রেশ্বরের 'বিবাদ-রত্নাকর', 'স্মৃতিরত্নাকর' (১৪ শতক), রঘুনন্দনের 'স্মৃতি' (১৬ শতক), কমলাকর ভট্টের 'নির্ণয়সিন্ধু' প্রকাশ হয় এবং এদের মত অনুসারে হিন্দুরা ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন।

দর্শন ঃ

বৈদিক সাহিত্য প্রসঙ্গে ষড়্দর্শনের কথা বলা হয়েছে। গৌতমের ন্যায়সূত্র খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের

লেখা। বাৎস্যায়ন এই সূত্রের উপর তাঁর 'ন্যায়ভাষ্য' টীকা লিখেছিলেন খৃষ্টীয় চার শতকের আগে। ছয় শতকে উদ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্তিক' এবং বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি তাঁর 'ন্যায়বিন্দু' লিখেছিলেন। দশ শতকে উদয়ন তাঁর 'ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি' প্রকাশ করেন। তাঁর আরও চারখানি গ্রন্থের নাম— 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' 'আত্মতত্ত্ব বিবেক', 'কিরণাবলী' এবং 'ন্যায় পরিশিষ্ট'। ঐ শতকেই জয়ন্ত তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' লেখেন। এগুলি প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থ। গঙ্গেশ 'নব্য-ন্যায়-শাখা'র প্রবর্তক। এই শাখা বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য। বার শতকে গঙ্গেশ তাঁর 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' প্রকাশ করেন। মিথিলার পক্ষধর মিশ্র তত্ত্ব-চিন্তামণির উপর তের শতকে 'আলোক' নামে গ্রন্থ লেখেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপ থেকে 'তত্ত্ব-চিন্তামণি ব্যাখ্যা' প্রকাশ করেন। তাঁর তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। রঘুনাথ 'দীধীতি' ও 'পদার্থখণ্ডন' এবং কৃষ্ণানন্দ তাঁর 'তন্ত্রসার' প্রকাশ করেন পনের শতকে। ষোল শতকে জগদীশ তাঁর 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' এবং সতের শতকে গদাধর তাঁর 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' লেখেন। ঐ শতকে বিশ্বনাথের 'ন্যায়সূত্রাবলী' প্রকাশিত হয়।

বৈশেষিক বা ঔলুক্যদর্শন ন্যায় দর্শনের সংগে কতকটা সংশ্লিষ্ট। কনাদ-এর 'বৈশেষিক সূত্র' খৃষ্ট পূর্ব তিন শতকের বলে মনে হয়। খৃষ্টীয় চার শতকে এর উপর টীকার মত লিখেছিলেন প্রশস্তপাদ তাঁর 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহে'। এর উপর আরো চারখানি টীকা আছে ঃ ব্যোমশেখরের 'ব্যোমবতী', শ্রীধরের 'ন্যায়-কন্দলী' উদয়নের 'কিরণাবলী' ও 'লক্ষণাবলী' এবং শ্রীবৎস বা বল্লভের 'ন্যায়লীলাবলী' (শেষের তিনটি দশ শতকে)। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এই কয়েকখানি বই উল্লেখযোগ্য ঃ—শিবাদিত্যের 'সপ্ত-পদার্থী' (এগার শতক), বরদরাজের 'তার্কিক-রক্ষা', কেশব মিশ্রের 'তর্কভাষা' (তের বা চৌদ্দ শতক), অন্নম্ ভট্টের 'তর্ক সংগ্রহ' ও 'দীপিকা' (ষোল বা সতের শতক), জগদীশের 'তর্কামৃত' (সতের শতক), বিশ্বনাথের 'ভাষা পরিচ্ছেদ' এবং তাঁরই লেখা টীকা 'সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী' এবং জয়নারায়ণের 'বিবৃতি' (সতের শতক)।

কপিলের 'সাংখ্যদর্শন' 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' প্রাচীনতম হলেও ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'ও খৃষ্টীয় তিন শতকে লেখা।

এই 'সাংখ্যকারিকা'র উপর টীকা 'মাঠরবৃত্তি' ও 'যুক্তিদীপিকা'। নয় শতকে বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্য-

তত্ত্ব কৌমুদী' খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অনিরুদ্ধের 'সাংখ্যসূত্রবৃত্তি' এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য' ও 'সাংখ্যসার' (ষোল শতক) 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে'র উপর উৎকৃষ্ট টীকা।

যোগ ও সাংখ্য পরস্পরের পরিপূরক। পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র উপর ব্যাস ভাষ্য লেখেন চার শতকে। বাচস্পতি এই ভাষ্যের উপর 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে গ্রন্থ লেখেন। আঠার শতকে 'ছায়া' নামে আর একখানি টীকা লেখেন নাগেশ ভট্ট। যোগ দর্শন বিষয়ে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ঃ—ভোজের 'রাজমার্তণ্ড', বিজ্ঞানভিক্ষুর 'যোগবার্তিক' এবং 'যোগসার সংগ্রহ'।

জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসাসূত্র' খৃষ্টপূর্ব চার শতকে প্রকাশ হয়। এর উপর টীকা লেখেন শবর খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে। এর নাম 'শবরভাষ্য'। মীমাংসা সূত্র ও এই ভাষ্যের তিন রকম ব্যাখ্যা করেন প্রভাকর, কুমারিল ও মুরারি। গৌড়-মীমাংসক ও গুরু নামে অভিহিত প্রভাকর ছয় শতকে তাঁর 'বৃহতী' নামে টীকা লেখেন। নয় শতকে এই বৃহতীর উপর 'ঋজু-বিমলা' নামে টীকা লেখেন শালিকনাথ। তাঁর আর একখানি গ্রন্থের নাম 'প্রকরণ পঞ্জিকা'। সাত শতকে কুমারিল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর

লেখা বইগুলির নাম—'শ্লোকবার্তিক', 'তন্ত্রবার্তিক' এবং 'টুপ্টীকা'। শ্লোকবার্তিকের উপর টীকা লেখেন ভবভূতি আট শতকে এবং সুচরিত মিশ্র তের শতকে তাঁর 'কাশিকা' নামে টীকা লেখেন। তন্ত্রবার্তিকের উপর 'তৌতাতিতমততিলক' নামে টীকা লেখেন ভবদেব ভট্ট এগার শতকে। টুপ্টীকার উপর 'বার্তিকাভরণ' নামে টীকা লেখেন ভেঙ্কট দীক্ষিত। আটশতকে মণ্ডন মিশ্র কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন—'বিধি-বিবেক', 'ভাবনা-বিবেক', 'বিভ্রম-বিবেক' এবং 'মীমাংসানুক্রমণী'। পার্থসারথি মিশ্রের 'শাস্ত্র দীপিকা', মাধবাচার্যের, 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' (চৌদ্দ শতক), আপদেবের 'মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশ' (সতের শতক কৃষ্ণযজ্বার 'মীমাংসা পরিভাষা' (আঠার শতক) মীমাংসা দর্শনের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বেদান্ত দর্শন। বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' খৃষ্টপূর্ব ছয় শতকে অথবা অন্যের মতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় দুই শতকের পূর্বে কোন সময় রচিত হয়েছিল। প্রাচীন বৈদান্তিকদের মধ্যে 'কারিকা' প্রণেতা গৌড়পাদ ও ভর্তৃহরির নাম উল্লেখযোগ্য। আট শতকে শঙ্করাচার্য তাঁর অমরগ্রন্থ 'শারীরক ভাষ্য' লিখেছিলেন। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যা

করেন বেদান্তের দুটি শাখা 'বিবরণ' ও 'ভামতী'। 'শারীরক ভাষ্যে'র প্রথম পাঁচটি পাদের 'পঞ্চপাদিকা' নামে টীকা লেখেন পদ্মপাদ আটশতকের গোড়ায়। বিদ্যারণ্য বা মাধব চৌদ্দ শতকে 'বিবরণে'র উপর 'বিবরণ-প্রমেয় সংগ্রহ' নামে টীকা লেখেন। 'ভামতী' শাখার মতামত জানা যায় বাচস্পতির 'ভীমতী'তে অমলানন্দের 'কল্পতরু' ও 'শাস্ত্রদর্পণে' (তের শতক) এবং অপ্পথ্য দীক্ষিতের 'পরিমল' গ্রন্থে। বেদান্তের পাঁচটি বিভিন্ন মত ব্রহ্মসূত্রকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। একটি মতের প্রবর্তক ভাস্কর। আট বা নয় শতকে তাঁর 'ভাষ্যে' ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। দ্বিতীয় মতের প্রবর্তক রামানুজ এগার শতকে তাঁর 'শ্রীভাষ্যে' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এর মূল হল তামিল গাঁথা এবং নাথমুনি ও যমুনাচার্য প্রভৃতি (দশ শতক) দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণব সাধুদের মতবাদে। রামানুজের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বেঙ্কটনাথ বেদান্ত-দেশিক তের শতকে তাঁর 'শত দূষণী', 'তত্ত্বটীকা' এবং 'সেশ্বর মীমাংসা' লিখেছিলেন। তৃতীয় মতের প্রবর্তক নিম্বার্ক। 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' নামে ব্রহ্মসূত্রের টীকাতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্ (এগার শতকে) প্রচার করেন। তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাশ আচার্য 'বেদান্ত কৌস্তুভ' নামে এক

টীকা লেখেন। পনের শতকে কেশব কাশ্মীরী 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে গীতার এক টীকা লেখেন। চতুর্থ মতের প্রবর্তক মধ্বাচার্য তের শতকে তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ছাড়াও 'অনুব্যাখ্যান' নামে এক-গ্রন্থে 'দ্বৈতবাদ' প্রচার করেন। ষোল শতকে বল্লভাচার্য তাঁর 'অনুভাষ্য' নামের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। পঞ্চম মতের প্রচারক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ' প্রচার করেন। ষোল শতকে বাংলায় যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় এঁরা তাঁরই মতের অনুসরণ করেন বলেন। তাঁর শিষ্য মহাপণ্ডিত রূপগোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা প্রকাশ করেন। তাঁর 'ক্রম সন্দর্ভ' প্রভৃতি ছয়টি সন্দর্ভ এবং 'সর্বসংবাদিনী' গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অমূল্য গ্রন্থ। আঠার শতকে বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দ ভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক টীকা লেখেন। তাঁর 'প্রমেয় রত্নাবলী'ও একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।

বৌদ্ধ দর্শনকে চারটি শাখায় ভাগ করা যায়— সৌত্রান্ত্রিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক এবং যোগচার। সৌত্রান্ত্রিকরা সূত্র বা সুত্তপিটকের উপর নির্ভর করেন। নৈয়ায়িক ধর্মোত্তর এবং বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষের টীকাকার 'যশোমিত্র' এই মতের অনুসরণ করেন।

বৈভাষিকা সূত্র বাদ দিয়ে অভিধর্ম পিটকের টীকা, 'বিভাষা'র উপর নির্ভর করেন। এঁদের প্রধান গ্রন্থ কাত্যায়নী পুত্রের 'জ্ঞান প্রস্থান' বুদ্ধদেবের নির্বাণের প্রায় তিনশ বছর পরে লেখা।

মহারাজ কণিষ্কের আহূত ধর্মসভায় পাঁচ শ' অর্হৎ দিয়ে লেখা হয়েছিল 'মহাবিভাষা'। শতসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার লেখক নাগার্জুন মাধ্যমিকা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ঐ গ্রন্থেই 'মহায়ন সূত্র' লিপিবদ্ধ আছে। শূন্যতার জ্ঞানই চরম জ্ঞান—ইহাই এ শাখার মত। নাগার্জুনের 'মাধ্যমিককারিকা' এবং এরই উপর তাঁর লেখা টীকা 'অকুতোভয়' মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ। যোগাচার শাখায় প্রবর্তক ছিলেন অসঙ্গের গুরু 'মৈত্রেয় নাথ'। তাঁর লেখা 'অভিসময়ালঙ্কার কারিকা' এবং 'যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র' 'বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই'—এই মতবাদ প্রচার করে।

জৈনদের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখার বিভিন্ন মত। দিগম্বরদিগের প্রধান গ্রন্থকার কুণ্ডকুণ্ড। তাঁর সব গ্রন্থই প্রাকৃত ভাষায় লেখা। তিন শতকে উমাস্বামীর সংস্কৃতে লেখা 'তত্ত্বার্থাধিগম' সূত্র উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমাদর পেয়ে থাকে। দিগম্বর দার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকর পাঁচশতকে 'তত্ত্বার্থাধিগম' সূত্রের উপর টীকা

এবং 'ন্যায়াবতার' ও 'সম্মততর্কসূত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। শ্বেতাম্বর দার্শনিক হরিভদ্র দিঙনাগের 'ন্যায় প্রবেশে'র উপর টীকা ছাড়াও 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়' এবং 'লোক তত্ত্ব নির্ণয়' প্রকাশ করেন। পনের শতকে সকল-কীর্তি 'তত্ত্বার্থ সারদীপক' নামে এক বিরাট গ্রন্থ লেখেন এবং শ্রুতসাগর 'জিনেন্দ্রযজ্ঞ বিধি' এবং 'তত্ত্বার্থ দীপিকা' রচনা করেন। সতের শতকে যশোবিজয় 'জ্ঞান বিন্দু প্রকরণ' ও 'জ্ঞানসার' প্রকাশ করেন।

জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদের প্রচারক চার্বাক প্রভৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' এঁদের কথা জানা যায়। এই দর্শনের লেখকদের মধ্যে সঞ্জয়, অজিত কেশকম্বলী, পুরাণ কাশ্যপ, মস্করী গোসাল এবং কোকুড় কাত্যায়নের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান-যুগের সাহিত্য

পাঠান বা সুলতানী যুগ ঃ

মুসলমান অর্থাৎ পাঠান ও মোগলদের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা লোপ হয়নি। এ বিষয়ে পূর্বে সতের বা আঠার শতক পর্যন্ত যে সব লেখক ও তাঁদের লেখার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে ভালভাবে জানা যায়। অবশ্য, সুলতানী আমলে সুলতানদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় পারসিক (পার্সী বা ফার্সী) সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তখনকার ভারতে পারসিক ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খসরু। জিয়াউদ্দিন বরনি ও মিনহাজউদ্দিন প্রভৃতি ঐতিহাসিক পারসিক ভাষায় কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস লিখেছিলেন।

প্রাদেশিক সাহিত্য ঃ

সুলতানী আমলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিকাশ।

উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ঃ

হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে চাঁদ বরদাই, জগনায়ক, বাবা গোরখনাথ প্রভৃতির নাম

উল্লেখযোগ্য। আমীর খসরুও হিন্দী ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন। রামানন্দ ও কবীর প্রভৃতি ধর্ম-সাধকগণের রচনায় হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি-ধর্মের প্রচারকগণ 'ব্রজ ভাষায়' যে সকল অনুপম গীতি রচনা করেছিলেন, সেগুলিও হিন্দী সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। উর্দু ভাষা মূলতঃ হিন্দী, তবে ওতে আরবী ও পারসী ভাষার কথাও যথেষ্ট রয়েছে।

শিখ-ধর্মের প্রবর্তক নানক ও তাঁর শিষ্যগণের চেষ্টায় পাঞ্জাবী ভাষা যেমন উন্নত হয়েছিল, তেমনি জ্ঞানেশ্বর, একনাথ ও নাথস্বামী প্রভৃতির রচনায় মারাঠী সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। বিদ্যাপতির পদ-রচনায় মৈথিলী ভাষা এবং মীরাবাঈ-এর রচনায় রাজস্থানী ভাষা বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বাংলা :

সুলতানী আমলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই উন্নতিতে সাহায্য করেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিরা। সুলতানরা অনেক সময়

সাম্প্রদায়িকতার উপরে থেকে হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় 'রামায়ণ' কবি কৃত্তিবাস এবং 'পদ্মপুরাণ' 'মনসামঙ্গল' কবি বিজয় গুপ্ত এ যুগেই রচনা করেছিলেন। রাজা গণেশ ও হুসেন শাহের বংশ বাংলার সিংহাসনে চৌদ্দ শতকের মাঝ থেকে ষোল শতকের মাঝ পর্যন্ত যে দু'শো বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক নবযুগের সূচনা হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত কবি ও দার্শনিক রূপগোস্বামী ও তাঁর ভাই সনাতন গোস্বামী সুলতান হোসেন শাহের দুই হাত ছিলেন বলা চলে। তাঁরা সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক রচনা করে গেছেন, যার কথা সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার সংগে বলা হয়েছে। রূপগোস্বামী তাঁর 'উদ্ভব সন্দেশ' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য ভাগীরথী-তীরে রামকেলিতে বসে রচনা করেছিলেন। ঐ রামকেলিতে কবি চতুর্ভুজ ১৪৯৩ 'হরিচরিত' নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ে সংস্কৃতে এক মহাকাব্য রচনা করেন। রূপগোস্বামীর 'পদাবলী'তে রামকেলির এরূপ অনেক কবির কৃষ্ণলীলা বিষয়ক শ্লোক সংগৃহীত আছে।

পাঠান সুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু হুসেন শাহের

পোষকতায় মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি হয় মালাধর বসু বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত যশোরাজ খাঁ প্রমুখ কবিদের সাহিত্য-সাধনার ফলে। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। এই হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২) গৌড়ের সিংহাসনে বসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্তরিক পোষকতা করেন। তাঁরই আদেশে শ্রীধর নন্দী 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। নসরতের ছেলে আলাউদ্দীন-ফিরুজ-শাহ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখিয়েছিলেন।

উড়িষ্যা ঃ

ষোল শতকের প্রথম দশকে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে বাংলার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়িষ্যায় আসেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের বাণী প্রচার করেন। ফলে উড়িষ্যার-সাহিত্য সংস্কৃতিতে এক নতুন প্রাণ-গঙ্গা বইতে শুরু করে।

আসাম ঃ

ষোল শতককে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বলা যায়। এর আগের সাহিত্যের মধ্যে

মাধব কন্দলির 'রামায়ণ', সুকবি নারায়ণের 'পদ্মপুরাণ' দুর্গাবরের 'গীতি-রামায়ণ' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রচারক শংকরদেব এবং তাঁর শিষ্য মাধবদেব সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। শংকর দেবের 'কীর্তন ঘোষা' অতি উচ্চ স্তরের ধর্মগ্রন্থ। তিনি কয়েকখানি কাব্য ও নাটক এবং 'বরগীত' রচনা করেছিলেন; এবং ভাগবতের অনেকগুলি স্কন্ধ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। মাধবদেবেরও কয়েকখানি নাটক ও 'বরগীত' আছে। এঁর লেখা 'ভক্তিরত্নাবলী' এবং 'নাম ঘোষা' ভক্তি-মূলক উপাদেয় গ্রন্থ।

শংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে রাম-সরস্বতী, অনন্ত কন্দলি, শ্রীধর কন্দলি, রামচরণ ঠাকুর প্রভৃতি সাহিত্যিকরা অনেক সুললিত কাব্য রচনা করেন। ভট্টদেব অসমীয়া গদ্যে 'কথা গীতি' ও 'কথা ভাগবত' রচনা করেছিলেন। রঘুনাথের 'কথা রামায়ণ' প্রাচীন অসমীয়া গদ্যসাহিত্যে অমূল্য গ্রন্থ। এ রকম গদ্য সাহিত্য তখনকার ভারতে বিরল। অসমীয়া 'বুরঞ্জি' বা ইতিহাসগুলিও গদ্যে লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে হলিরাম ফুকনের 'আসাম বুরঞ্জি' প্রসিদ্ধ, এটা পরবর্তী কালে ঊনিশ শতকে লেখা।

এভাবে ইসলামের সংঘাতে যেমন ধর্ম, তেমনি

সাহিত্যও মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্ণের পণ্ডিতদের হাতে না থেকে ক্রমে সাধারণের অনুশীলন-যোগ্য হয়ে উঠেছিল। দেব-ভাষা সংস্কৃত ক্রমে লোক-ভাষার কাছে তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। চৌদ্দ শতকে কবি আমীর খসরু বলেছিলেন যে, পারসী ও আরবী ভাষা অপেক্ষা হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অনেক সমৃদ্ধ ও গতিশীল।

মোগল যুগ ঃ

মোগল-যুগের প্রধান গৌরব জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি। সর্দার পানিকর বলেছেন যে, "কালিদাসের কালের পরে ভারতের ইতিহাসে আর কোন কালে মোগল-আমলের মতো সাহিত্যের চরম বিকাশ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" সংস্কৃত ও তার সঙ্গে পারসীর চর্চা মোগল-যুগে যথেষ্ট বাড়লেও হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি জাতীয় মাতৃ-ভাষায় রচিত সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ঐ যুগের পারসী (পারসিক) সাহিত্যকে ইতিহাস, অনুবাদ ও কবিতা এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আবুল ফজল, বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী ও খাফী খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। আবুল

ফজল 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' নামে দুইখানি বিখ্যাত ইতিহাস লেখেন। তিনি আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সভাসদ্ ছিলেন এবং তিনি কেবল ঐতিহাসিক ছিলেন না, একাধারে কবি, সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। বদাউনীও আকবরের আমলে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর লেখা 'মন্তখব-উল-তোয়ারিখ' সুবিখ্যাত গ্রন্থ। আকবর সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় রচিত বহু ভারতীয় পুস্তক পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। বিভিন্ন মুসলমান পণ্ডিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করে 'রজমনামা' নামে সংকলিত করেন। বদাউনী দীর্ঘ চার বছর পরিশ্রম করে 'রামায়ণের' অনুবাদ করেন। ফৈজী সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র 'লীলাবতী' এবং হাজী ইব্রাহিম শরহিন্দী 'অথর্ববেদ' অনুবাদ করেন। আকবরের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন গিজলী। গিজলীর পরেই আবুল ফজলের ভ্রাতা আবুল ফৈয়জ বা ফৈজীর স্থান। জাহাঙ্গীরের সময়েও পারসী সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ভারতীয় পারসী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শাহজাহানও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাহজাহানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর

'পাদশাহ নামা' একটি বিখ্যাত রচনা। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিও 'অথর্ববেদ' ও 'উপনিষদ'গুলির অনুবাদ করিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব নিজে সুপণ্ডিত হলেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাননি। তাঁর আমলে খাফী খাঁকে তাঁর ইতিহাস গোপনে রচনা করতে হয়েছিল।

সুলতানী আমলের শেষ ভাগ থেকে প্রাদেশিক ভাষাগুলি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। মোগল যুগে সেগুলি রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। মোগল-আমলের গোড়ার দিকে কবি মালিক মহম্মদ জয়সী মেবারের পদ্মিনীর কাহিনী নিয়ে হিন্দী ভাষায় 'পদ্মাবৎ' রূপক কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় শেরশাহের উচ্ছসিত প্রশংসা রয়েছে। সম্ভবতঃ শেরশাহ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের আমলে হিন্দী সাহিত্যে এক নব যুগের সূত্রপাত হয়। আকবরের সভাসদ্‌গণের মধ্যে বীরবল, রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ ও টোডরমল, সকলেই হিন্দী কবিতা রচনা করতেন। বীরবলকে আকবর 'কবিরায়' উপাধি দিয়েছিলেন। আকবরের অন্যতম মন্ত্রী আবদুল রহিম খান-ই-খানান হিন্দী ভাষায় যে সকল দোহা রচনা করেছিলেন, সেগুলি

আজও সাদরে উত্তর ভারতে পঠিত ও গীত হয়ে থাকে। এই যুগেই আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অসংখ্য গীত রচনা করেন, রামদাস কীর্তন গেয়ে এবং পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য লিখে হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধেও বহু কবিতা লেখা হয়। কাশীর বিখ্যাত কবি তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩) 'রাম-চরিত মানস' নামে তাঁর বিখ্যাত রামায়ণ এই যুগেই রচনা করেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে হিন্দী কবিতার অবনতি ঘটে। মোগল-যুগে উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার বিশেষ চর্চা হয়নি। তবে দক্ষিণ ভারতে উর্দু সাহিত্য খুবই উন্নত হয়ে উঠে। দক্ষিণ ভারতের উর্দু কবিগণের মধ্যে ঔরঙ্গাবাদের ওয়ালি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

মোগল-যুগে বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। এই যুগে রচিত 'পদাবলী', 'কড়চা' ও চৈতন্য-জীবনীগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (জন্ম ১৫১৭) এবং বৃন্দাবন দাস (জন্ম ১৫০৭) যথাক্রমে 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং 'চৈতন্য ভাগবত' নামে দুইখানি অপূর্ব চৈতন্য-জীবনী রচনা করেন। লোচনদাস ও জয়ানন্দের (জন্ম ১৫১৩) 'চৈতন্য মঙ্গল' নামে চৈতন্য জীবনখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত চণ্ডী ও মনসা দেবীর

এবং ধর্মঠাকুরের স্তুতিমূলক বহু কাব্য-কাহিনীও লেখা হয়েছিল! দেবতারা মানুষের মঙ্গল করেন; তাঁদের কথা নিয়ে যে কাব্য রচনা হয় এবং যাকে ঘরে রাখলে গৃহস্থের মঙ্গল হয় তাকেই বলে মঙ্গলকাব্য। মনসা-মঙ্গলের আদি কবি হরি দত্ত। তারপর নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশী দাস ও ক্ষেমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। তাঁর পর দ্বিজ মাধব ও জনার্দনের নাম করতে হয়। সবার মধ্যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের সবচেয়ে প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তী (সতের শতক)। তাছাড়া রামদাস আদক, ঘনলাল চক্রবর্তী, মানিকলাল গাঙ্গুলী প্রভৃতিও ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা আগেই বলা হয়েছে। আরও যে কয়জন কবি বাংলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন তাঁর মধ্যে অনন্ত কন্দলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ষোল শতকে মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীও একখানি 'রামায়ণ' রচনা করেন। রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম রসায়ণ' একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ; এর ভাষা, ছন্দ ও কাহিনী সুন্দর। সতর শতকে কাশীরাম দাস তাঁর বিখ্যাত 'মহাভারত' রচনা করেন। তাঁর বড় ভাই কৃষ্ণদাস

'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' এবং ছোট ভাই গদাধর 'জগন্নাথমঙ্গল' লেখেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি অপূর্ব কাব্যগুলি এযুগে রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। ষোল শতকে জ্ঞানদাস পদাবলী রচনা করেন। লোচন দাস, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম দাসও সতের শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। আঠার শতকের মাঝামাঝি কবি রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলী রচনা করেন। তাঁর পরে কমলাকান্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সব পদাবলী লোক সংগীত বা লোক-সাহিত্য। বাউলদের গানের সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। বাউলরাও এক ধর্ম-সম্প্রদায়। তাদের গান শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সাধকের বুক-ফাটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। সূফীদের মুর্শিদ গান এবং সহজিয়াদের গানও সাধন সংগীত। তা ছাড়া মাঝিদের 'ভাটিয়ালী' ও সারি গান, ছাদ পিটানো গান, মেয়েদের নানারকম বিবাহ সংগীত, ছেলে-ভুলানো ছড়া, ঘুম-পাড়ানো ছড়া, বাংলার গীতি-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলা দেশে একদল শিব-ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন। এই নাথ পন্থীদের সাহিত্য সতের শতকের আগের লেখা নয়। নাথ-সাহিত্যে দুটি কাহিনী আছে। একটি ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্র রাজার গান নামে প্রচলিত। আর একটি গো-রক্ষ বিজয় বা মীনচেতন নামে পরিচিত।

মোগল-যুগে মারাঠা সাধু কবি তুকারাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'অভঙ্গ' বা অখণ্ড ভগবদ্ গীতিগুলি মারাঠী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিবাজীর গুরুদেব রামদাসও তাঁর রচনার দ্বারা মারাঠী সাহিত্যকে অতুল সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

আধুনিক যুগ ঃ

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সাহিত্যও অকস্মাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। মুসলমান আমল থেকে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিকাশ আরম্ভ হলেও উনিশ শতকে সেগুলি বলিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করেছিল। সাহিত্যের বিষয়-বস্তুও এ সময় বদলে যায়। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যে মানুষ ও সমাজের স্থান ছিল বটে, কিন্তু দেবতা ও পরলোকের স্থান ছিল তার অনেক

উপরে। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হল মানুষ ও মানুষের সমাজ। মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা, মানুষের চিন্তা-ভাবনা, মানুষের প্রেম-ভালবাসা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজের নানাবিধ সমস্যা হল সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপকরণ। এর উপর ভারতের মুক্তি সাধনায় যে জন-জাগরণ ও বলিষ্ঠ স্বাজাত্য-বোধ দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল, তার প্রভাব সাহিত্যের উপর বিশেষ ভাবে পড়ে। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ হতে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সাহিত্য-সেবী এই প্রভাবের রূপায়ণে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন।

বাংলা ঃঃ গদ্য-সাহিত্য ঃ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পত্তন হয় আঠার শতকে। এক পর্তুগীজ পাদ্রী 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে দু'খানা বই লেখেন। ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে পর্তুগালে শেষের বইটি ছাপা হয়। এর আগে বাংলা কোন বই-ই ছাপা হয় নি। ইংরাজ মিশনারী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি বাংলা গদ্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের শ্রীরামপুরের প্রেসে সমস্ত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ

এবং একখানি 'বাংলা ব্যাকরণ' ও 'বাংলা ইংরাজী অভিধান' ছাপা হয়। এগুলি প্রধানতঃ কেরীর লেখা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা 'কথোপকথন, নামে যে বইখানি এই প্রেসে ছাপা হয়, তাতে এদেশের লোকের কথ্য ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজদের বাংলা শেখার জন্য কলকাতায় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, তার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ঐ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পরে রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা', তারিণী মিত্রের 'ঈশপের গ্রন্থাবলী' চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র' প্রকাশিত হয়। এভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান বাংলা ও বাঙালী কোনদিন ভুলতে পারবে না।

এরপর এলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) পাদ্রীদের বিরুদ্ধে লিপিযুদ্ধ চালাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি 'সমাজকে এই সহস্র নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন'। ১৮১৬ সাল হ'তে তিনি 'পথ্য প্রদান', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'বেদান্ত চন্দ্রিকা', 'বেদান্ত গ্রহ', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ

করেন। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', বাঙলা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ।

তারপর এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম যথার্থ শিল্পী, আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁর নানারকমের কীর্তি ও দান থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।* * তিনি ইহাকে (বাংলা গদ্যকে) পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।' 'প্রথম ভাগ' 'দ্বিতীয় ভাগ' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক এবং সেই সংগে 'বোধোদয়', 'কথামলা' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং 'বাঙলার ইতিহাস' রচনা করেন। আবার সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অবলম্বনে 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' রচনা করেন।

সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের বেড়াজাল এবং দুরূহ শব্দাবলীর গুরুভার থেকে মুক্ত ক'রে বাংলা ভাষায় প্রথম স্বচ্ছন্দ গতি এনে দিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র [টেকচাঁদ ঠাকুর] (১৮১৩-৮৩)। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একটি 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকা প্রকাশের সংগে সংগে বাঙলা গদ্যে এক নূতন আন্দোলন

শুরু হয়। এই পত্রিকায় তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে উপন্যাস বের হতে থাকে, পরে তা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' নামে মদ্যপানের নিন্দাসূচক রচনা, 'কৃষিপাঠ' নামে কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ, 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা পুস্তক প্রভৃতি রচনা করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) অল্প বয়সেই তাঁর অমর কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর কয়েকখানি নাটকে এবং বেদব্যাসের মূল সংস্কৃত মহাভারতের আনুপূর্বিক বাংলা অনুবাদে। তাঁর 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' গদ্য ভাষার দিক থেকে অভিনব। তিনি আলালী ভাষাকে আরও বদলে কলিকাতাবাসীর মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) যুক্তিবাদী ; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন। তাঁর লেখা 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', 'চারুপাঠ', প্রভৃতি তাঁর পাণ্ডিত্য লেখনী শক্তির পরিচায়ক। এই সংগে আর একজন গদ্য-লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যিনি কলম ধরেছিলেন দেশ,

জাতি ও সমাজের সংস্কারের জন্যে। তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ'গুলি বিশৃংখল সমাজের উপর যেন চাবুকের আঘাত দিল। একই সংগে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), যাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায়। তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে পরে বলা হবে। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' প্রভৃতি মূল্যবান উপদেশ ও সেই সংগে কৌতুক রসে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ গদ্য-সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য সাধু ও চলিত রীতির অপূর্ব সামঞ্জস্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও বাঙলা গদ্য সাহিত্যে আর একটি উজ্জ্বল তারকা। তাঁর 'প্রকৃতি' বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ। তাঁর 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা' প্রভৃতি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশ প্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। উপরে লেখা প্রবন্ধ সাহিত্যের সংগে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৫৬-১৯১৯) রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৬-১৯৩১) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রভৃতির প্রবন্ধ সাহিত্যও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কথা পরে বলা হবে।

নাট্যসাহিত্য ঃ

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে আমাদের দেশের লোক যাত্রা দেখে, 'কবি পাঁচালি' গান শুনে নাট্যরসের আস্বাদ পেত। কবিগানের প্রচলন হয় আঠার শতকের শেষ দিকে। কবিয়ালদের অবলম্বন ছিল রাধাকৃষ্ণের গান, শ্যামাসংগীত বা 'উমা-মেনকা'কে নিয়ে আগমনী-বিজয়া গান। অনেক সময় আসরে দু'দলে কবিতার লড়াই চলত, একে বলে তরজা। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, আণ্টুনী ফিরিঙ্গি। কবিগানের মতো সেকালে পাঁচালি গানও হ'ত। পাঁচালিতে পালা ধরে গান চলত। পাঁচালিকার হিসাবে দাশু বা দাশরথি রায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকাল থেকেই লোক-নাট্যের আর একটা বিশেষ রূপ ছিল, তার নাম 'যাত্রা'। 'যাত্রা' কথাটার অর্থ দেবদেবীর পূজা-উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ঐসব উপলক্ষে যে গান, অভিনয় হ'ত তাকেই বলা হ'ত যাত্রা। যাত্রাকারদের মধ্যে গোবিন্দ

অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির নাম করা যায়। এর পরে সেক্সপীয়র-পড়া ইংরেজী-শিক্ষিত লোকদের কাছে কবি, পাঁচালি, যাত্রা ভাল লাগত না। ১৭৯৫ সালে রুশ-দেশীয় লেবেডেক সাহেব 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে দুটি ইংরেজী প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী নট-নটী দিয়ে অভিনয় করান। ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বাংলা মৌলিক নাটক'— সুভদ্রা অর্জুনের বিবাহ-কাহিনী নিয়ে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং জি. সি. গুপ্তের উপকথা জাতীর বাংলার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক 'কীর্তিবিলাস'। এরপর ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদের বেলঘরিয়ার বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' অভিনীত হয়। তিনি 'মালতীমাধব' নাটকেরও অনুবাদ করেন। 'রুক্মিণীহরণ', 'কংসবধ', প্রভৃতি কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও তাঁর রচনা। এছাড়া 'কুলীন-কুলসর্বস্ব', 'নবনাটক', 'বুঝলে কিনা', 'উভয়সঙ্কট' প্রভৃতি সামাজিক প্রহসনও তাঁরই রচনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) কাব্য ও নাটক রচনায় আধুনিক যুগের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

নাটক রচনার মধ্যেই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রথম দেখা যায়। রত্নাবলীর মতো সাধারণ নাটকের অভিনয় দেখে বন্ধুদের তাক্ লাগাবার জন্য পরের বছর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লেখেন। তারপর লেখেন 'পদ্মাবতী' এবং শেষে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। মধুসূদনের নাটকগুলিতে সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী থাকলেও ইংরাজী নাটক বা গ্রীক কাহিনীরও পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক অপেক্ষা তাঁর ভাষা সরল ও জীবন্ত হয়েছিল দুটি প্রহসনে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে আর একজন প্রধান ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯-১৮৭৩)। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত তখনকার বাংলার কৃষকদের ছবি ধরে দিয়েছিল তাঁর অমর নাটক করুণরস প্রধান 'নীলদর্পণ'। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলিতে হাস্য-রসই প্রধান। অবশ্য তাঁর 'সধবার একাদশী'তে হাসিও চোখের জল মিলে গিয়েছে। তাঁর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক' প্রভৃতির নাম করা চলে। পতিত মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি, বাস্তবতা এবং সরস-কৌতুক দীনবন্ধুর রচনার প্রধান গুণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) ছিলেন এ যুগের

সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ইনি শুধু লেখক ছিলেন না, নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। ভক্তিরস, দেশপ্রেম, সমাজগ্লানি, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতি অবলম্বনে তিনি প্রায় একশ' খানি নাটক ও প্রহসন লিখেছিলেন। তাঁর 'চৈতন্য-লীলা', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণবর্জন', 'শ্রীবৎস ও চিন্তা', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি এখনও দর্শক ও পাঠকদের নিকট বিশেষ প্রশংসা লাভ করে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং প্রহসন সব রকমের নাটক লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে তিনি দেশপ্রেম উদ্বোধনে বিশেষ সহায়তা করে গেছেন। তিনি শুধু নাট্যকার ছিলেন না,—বাংলার চারণ-কবিও ছিলেন। 'কল্কি অবতার' প্রভৃতি প্রহসন এবং 'সীতা', 'পাষাণী' ও 'ভীষ্ম' তিনখানি পৌরাণিক নাটক, 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক এবং 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' প্রভৃতি সামাজিক নাটক তাঁকে অমর করে রাখবে।

অমৃতলাল বসু (১৮৫০-১৯২৯) লঘু কৌতুক এবং

রঙ্গবিদ্রূপের জগতে বিচরণ করতেন। তাঁর 'খাসদখল', 'চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে', 'তাজ্জব-ব্যাপার', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'তিলতর্পণ', 'বাবু', 'বৌমা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) 'ভীষ্ম', 'নর-নারায়ণ' প্রভৃতি পৌরাণক নাটকে ধর্মভাব ও ভক্তিরস, 'প্রতাপাদিত্য', 'বাংলার মসনদ', 'আলমগীর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশ প্রেম ফুটে উঠেছে। নাচগানে ভরা 'আলিবাবা', 'আলাদিন', 'বেদৌর' প্রভৃতি বঙ্গনাট্য তাঁর রচনা।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা-প্রতিভার কথা তাঁর অন্য প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

উপন্যাস ও ছোট গল্প ঃ

প্রথমেই বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে হবে। তিনি সত্যই 'সাহিত্য সম্রাট' ছিলেন। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হওয়া মাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'দেবী চৌধুরানী,' 'সীতারাম', প্রকাশিত হয়। তাঁর আনন্দমঠ ও তার

ভিতরে 'বন্দেমাতরম্' সংগীত দিয়ে তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। যার জন্য আজ তিনি ঋষি বংকিমচন্দ্র নামে অমর হয়ে আছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' এবং 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' এ দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবী কংকণ' নামে আধা ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'সংসার ও সমাজ' নামে সামাজিক দু'টি উপন্যাস লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) উপন্যাস ও ছোট গল্প দুই রচনা করে রবীন্দ্রানুগ লেখকদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন ; তিনি 'রমাসুন্দরী', 'সিদূঁর কৌটা', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'জীবনের মূল্য' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লেখেন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে। এগুলির মধ্যে 'নবকথা', 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি', 'পত্রপুষ্প', 'গহনার বাক্স' প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁর 'মাষ্টারমশায়', রসময়ীর 'রসিকতা', 'বলবান জামাতা' প্রভৃতি গল্পে কৌতুক রসই মূল আশ্রয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩৮)। শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত সকল রকম বাঙালী পাঠকদের কাছে তিনি

প্রিয়। ইতিহাস নিয়ে তিনি একখানিও উপন্যাস রচনা করেন নি। তাঁর উপন্যাসে বর্তমান জীবনের বাস্তব ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'অরক্ষণীয়া', 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিত মশায়', 'বড় দিদি', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি যেমন ছোট উপন্যাস তেমনি 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প রচনা খুব সার্থক না হলেও 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশ বৈরাগী' গল্পগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য স্বীকার করতেই হবে। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি অনেকগুলি বড় সুন্দর গল্প লিখেছেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী।

বহুমুখী প্রতিভার আধার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্বন্ধে তাঁর কাব্য আলোচনার সঙ্গে বলা হবে।

কাব্য ও কবিতা ঃ

উনিশ শতকের প্রথম হতেই বাঙালী ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিল। পুরাতনের বাঁধাধরা

পথ ও চর্বিত চর্বণ থেকে নতুনের সন্ধানে বাঙালী ব্যাকুল হয়ে উঠল। পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব সংঘাতে দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ঐ যুগের বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে নয়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায়। বংকিমচন্দ্র রঙ্গলাল প্রভৃতি অনেক লেখক ও কবি প্রথম জীবনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বংকিমচন্দ্র বলেছিলেন "ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলার কবি, খাঁটি বাঙালীর কবি।"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-সাধনা তাঁর শিষ্য রংগলালের রচনায় সার্থক হয়ে উঠে। রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যান কাব্যের রচয়িতা। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার পথ তিনিই প্রথম খুলে দিলেন 'পদ্মিনী' কাব্যে। তাঁর কবিতার প্রথম সুর স্বদেশ-প্রেমের প্রচার।

অতুল কবিত্ব শক্তির অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য-কবিতায় নতুন যুগকে ডেকে আনলেন। পুরাতন কাব্য কবিতার ভাষা ও ছন্দ রীতিতে আমুল পরিবর্তন না আনলে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। তিনি যে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন তার নাম 'অমিত্রাক্ষর', 'তিলোত্তমা সম্ভব' তাঁর প্রথম কাব্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'

তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য এবং 'চতুর্দশপদাবলী' কাব্যও রচনা করেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক নতুন সুর আনলেন। তিনি বাংলার প্রথম দ্বিধাহীন কবি। তাঁর কবিতায় কোন আদর্শ প্রচারের চেষ্টা নেই। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গুরু এবং আধুনিক গীতিকাব্যের জনক। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'বাউল বিংশতি', 'কবিতা ও সংগীত', 'সারদামংগল', ও 'সাধের আসন' প্রধান।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। স্বদেশ-প্রেম এবং চিন্তার উল্লাস তাঁর কাব্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'বৃত্রসংহারে'র মতো মহাকাব্য, 'কবিতাবলী', 'বিবিধ কবিতা', 'চিত্ত বিকাশের' মত খণ্ড কবিতার সঙ্কলন 'চিন্তা তরঙ্গিনী', 'ছায়াময়ী' 'আশাকানন', 'বীরবাহু', 'দশ মহাবিদ্যা', প্রভৃতি কাহিনী ও বর্ণনা প্রধান কাব্যও তিনি রচনা করেন। তাঁর 'ভারত-সংগীত' বাংলা ও বাঙালীকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এখনও করে থাকে।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) 'আখ্যান কাব্য' 'খণ্ডকবিতা' এবং 'মহাকাব্য' রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য দেশী কবিদের মধ্যে মধুসূদনের দ্বারা এবং বিদেশী কবিদের মধ্যে বায়রনের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রঙ্গমতী' ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি আখ্যান কাব্য, 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', প্রভৃতি মহাকাব্য এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'অবকাশ রঞ্জিনী' নামক খণ্ড কাব্য রচনা করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) শুধু বংগ-সাহিত্যের নয় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং সমগ্র পৃথিবীর কবি-সমাজের একেবারে প্রথম শ্রেণীর একজন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার শাখা তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প লেখক। নাট্যকার হিসাবেও তাঁর স্থান খুবই বিশিষ্ট। উপন্যাস রচনায়ও তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন এবং নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। বিচিত্র ধরনের প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি ছিলেন অগ্রণী। একই সঙ্গে সৃষ্টির এই বিচিত্রতা, শিল্পের উৎকর্ষ এবং ভাব-এরূপ গভীরতা একই ব্যক্তির মধ্যে সম্মিলিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ।

প্রথম পর্বের কাব্য গ্রন্থের নাম—'সন্ধ্যাসঙ্গীত',

'প্রভাতসঙ্গীত,' 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', ও 'চৈতালী' প্রভৃতি। তৃতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', এবং 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি। চতুর্থ পর্বের কাব্যগ্রন্থের নাম 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' প্রভৃতি। পঞ্চম পর্বের প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা', 'পলাতকা', 'শিশু ভোলানাথ', 'মহুয়া', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি। ষষ্ঠ পর্বে তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' প্রভৃতি। সপ্তম পর্বে 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'প্রবাসিনী', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যা', 'পরিশেষ', 'আরোগ্য' এবং 'জন্মদিন' ও 'শেষলেখা' প্রভৃতি রচনা করেন।

ছড়া ও গান ঃ ছোটদের জন্য তিনি 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' নামে দু'খানি সচিত্র ছড়া কবিতার বই রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আড়াই হাজারেরও উপর গান লেখেন। এগুলির অনেকগুলি তিন খণ্ডে 'গীতবিতানে' সংকলিত হয়েছে। এ সব গানের সুর তাঁর নিজের সৃষ্টি।

নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য ঃ রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের নাটক প্রহসন রচনা করেন—গীতিনাট্য,

নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য, সাধারণ অভিনয়ের উপযোগী নাটক, রূপক ও সংকেত নাটক ও প্রহসন। এর মধ্যে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' (সাধারণ নাটক), 'রাজর্ষি', 'চিত্রাঙ্গদা' (নাট্যকাব্য), 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষ রক্ষা', 'চিরকুমার সভা' (প্রহসন), 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব', 'শেষবর্ষণ' (প্রকৃতি ও ঋতু বিষয়ক), 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ' (রূপক ও সংকেত নাটক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছোট গল্প ঃ রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় ছোট গল্পের স্রষ্টিকর্তা বলা চলে। তাঁর ছোট গল্পগুলি তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ', 'তিন সঙ্গী', প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে। তাঁর 'কাবুলীওয়ালা', 'সুভা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'ঠাকুর্দা' প্রভৃতি গল্প অপূর্ব।

উপন্যাস ঃ তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমের অনুসরণ লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'। প্রথম জীবনের উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি, প্রত্যেকটিতে কোন-না-কোন তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, 'শেষের

কবিতায়' প্রেমের তত্ত্ব, 'চতুরঙ্গ'তে আত্মসাধনা, 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়ে' স্বাদেশিকতা।

প্রবন্ধ ও পত্র সাহিত্য ঃ রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমে নাম করতে হয় তাঁর সাহিত্য সমালোচনা। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি এই জাতীয় প্রবন্ধ। 'কালান্তর', 'স্বদেশ', 'সমাজ' প্রভৃতিতে তিনি রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি সর্বদা বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' আত্মচরিত বা আত্মোপলব্ধি মূলক রচনা। রবীন্দ্র প্রতিভার আর একটি দিক, তাঁর অগণিত পত্র-সাহিত্য। তাঁর 'জাপান-যাত্রীর ডায়েরী', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'ছিন্নপত্র' এই জাতীয় সাহিত্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর হোল মানবতার জয়গান। তিনি সুন্দরের পূজারী। দেশ ও দশকে তিনি কখনও ভুলেন নি। জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথের দান অবিস্মরণীয়।

তমিল (তামিল) সাহিত্য ঃ

ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে সংস্কৃত সাহিত্যের পরেই মৌলিকত্বে, মনোহারিত্বে, প্রসারে, বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে তমিল

(তামিল) সাহিত্যের স্থান। এর প্রাচীন গ্রন্থ কবি তিরুবল্লুবর কর্তৃক রচিত 'কুরল্' বা 'মুপ্পাল'। এর প্রশংসায় অনেক অত্যুক্তি থাকলেও সেকালের তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক সন্দেহ নেই। যতদূর জানা গিয়েছে এটি খৃষ্টীয় প্রথম হ'তে ছয় শতকের মধ্যে লেখা। বৌদ্ধদের মহাকাব্য 'মনিমেকলাই', জৈনদের মহাকাব্য 'জীবকচিন্তামণি' এবং 'শিলপ্পদিকরম্' (পাদভূষণ সম্বন্ধে) মহাকাব্যে সেকালের জীবনের ছবি আঁকা আছে। মুসলমান যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে বলার সময় বৈষ্ণব ও শৈব সাধুদের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। কম্বণের রামায়ণ বোধ হয় বার শতকের রচনা। তারপর আঠার শতক পর্যন্ত অন্ধকারময় যুগ। বিশ শতকে কবি তামিল-'ভারতী' তামিল-সাহিত্যে আবার প্রাণ-সঞ্চার করেন। কাব্যের মধ্যে কবিমণি দেশিকবিনায়কম্ পিল্লাইয়ের (জন্ম ১৮৭৫) 'এশিয়া', 'জ্যোতি', 'ওমর খৈয়াম' (অনুবাদ), নামক্কল রামলিঙ্গম্ পিল্লাইয়ের 'তমিজন,' 'ইদায়ুম', 'সোনাওলী' এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ ভারতীর (জন্ম ১৮৯৭) 'ভারতশক্তি মহাকাব্যম্' এবং যোগীর 'সোমসুন্দরম্' প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। উপন্যাস, ছোট গল্প ও নাটকের মধ্যে শ্রীমতী রঙ্গনয়গী (শ্রীমতী কুমুদিনী)র লেখা 'নন্দুবিন', 'পোণ্ডানল',

'দেবান বাহাদুর মগল', কৃষ্ণমূর্তির (কল্কি) লেখা 'কল্বনন কথালি', 'ত্যাগভূমি', 'পার্থিপন', 'কানাবু' এবং শ্রীমতী সাবিত্রী অম্মলের 'দৈয্বথু ক্বামেল' ও 'অপরাজিতা', বিজয় রাঘবাচারিয়ারের 'দোল্লসাবেলই' 'বসন্থন', রাম-স্বামীর 'সুন্দরী', 'চিন্নাচন্থু' এবং রাজাগোপালাচারীর 'ব্যাসর বইয়ন্ধু' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

হিন্দী সাহিত্য ঃ

মুসলমান যুগের হিন্দী সাহিত্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ হয় ঊনিশ শতকে 'ভারতেন্দু' হরিশ্চন্দ্রের সংগে। প্রধানতঃ নাট্যকার হলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল এবং সংস্কার ও দেশপ্রেমই ছিল তাঁর লক্ষ্য। হিন্দী সাহিত্যকে নতুনভাবে গড়ে তুলে তিনি 'খাড়িবোলি'কে গদ্যের আদর্শ ভাষা ঠিক করেন। তাঁর পরে সরস্বতী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত দ্বিবেদী, 'প্রিয়প্রবাদের' লেখক অযোধ্যাপ্রসাদ উপাধ্যায় এবং 'ওমর খৈয়াম', 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতির অনুবাদক মৈথিলিশরণ গুপ্ত (ভারত-ভারতীর লেখক) বিখ্যাত। হিন্দী ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক প্রেমচন্দ (মৃত্যু ১৯৩৬) মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি আন্দোলনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর 'সেবাসদন', 'প্রেম আশ্রম', 'রঙ্গভূমি'ও 'কর্মভূমি'তে তাঁর দেশপ্রেমও

সমাজ সংস্কারের আদর্শ ফুটে উঠেছে। 'গোদান' ও 'কাফন' প্রভৃতি গল্পে কৃষক ও দিনমজুরের বাস্তব জীবনের ছবি পাওয়া যায়। 'বিপ্লব'এর সম্পাদক, 'পার্টি কমরেড,' 'অমিতা' প্রভৃতির লেখক বিপ্লবী যশপাল এবং 'যৌনতত্ত্ববিদ' ঔপন্যাসিক ইলাচাঁদ যোশী, ভগবতীচরণ বর্মা প্রভৃতি প্রেমচন্দের পথ অবলম্বন করেন। রবীন্দ্র-নাথের প্রভাবে হিন্দী কাব্য জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী—নিরালা—('পরিমল', 'গীতিকা', 'অপ্সরা', 'আটক', 'রবীন্দ্র কবিতা কানন' প্রভৃতির লেখক), 'উচ্ছাস', 'গুঞ্জন', 'পল্লব', 'গ্রন্থি', 'মানবপণ' কাব্যের লেখক সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং 'দীপশিখা' কাব্যের মহিলা কবি মহাদেবী বর্মা প্রভৃতি 'ছায়াবাদী' দ্বারা গতানুগতিকতার বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিল। প্রেমচন্দের ছেলে অমৃত রায় 'বীজ' উপন্যাস এবং কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক ভগবতী চরণের 'চিত্রলেখা', 'তেরে মেরে', 'রাস্তে' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'হুঙ্কার', 'কুরুক্ষেত্র', 'কলিঙ্গবিজয়', 'চক্রবাল' প্রভৃতির জনপ্রিয় আধুনিক কবি বিহারের রামধারী সিংহ (দিনকর) তাঁর 'সংস্কৃতিকী চার অধ্যায়' লিখে ১৯৫৯ সালে আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বালকৃষ্ণ শর্মা (জন্ম ১৯০১), বেচন শর্মা (জন্ম ১৯০১), হরিবংশ রায় (জন্ম ১৯০১), হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, রাহুল সংকৃত্যায়ন, ঊষাদেবী মিত্র (মহিলা কবি) প্রভৃতির নামও হিন্দী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

উড়িয়া সাহিত্য ঃ

আধুনিক উড়িয়া সাহিত্যের অগ্রদূত ছিলেন রাধানাথ রায় (১৮৪৮—১৯০৮), ফকীর মোহন সেনাপতি এবং মধুসূদন রাও (১৮৫৩—১৯১৯)। অশ্বিনী কুমার ঘোষ, গোদাবরিস মিশ্র (মৃত্যু ১৯৫৭) তাঁদের নাটকের জন্য বাংলার নাট্যকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট ঋণী। বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক 'চতুর্দশপদী কবিতা' এবং বাংলা সাহিত্যের অনুকরণে 'উপেক্ষিতা' প্রভৃতি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। ঔপন্যাসিক নিত্যানন্দ মহাপাত্র এবং গোপীনাথ মহান্তির নাম উল্লেখযোগ্য; গোপীনাথ তাঁর 'অম্রুতের সন্তান' লিখে ১৯৫৫ সালে আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন। শচী রাউৎ রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন ইংরাজী অনুবাদে তার নাম 'মাঝির গান'। ঔপন্যাসিক কানু মোহান্তির 'হা অন্ন', 'কা' প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

অসমীয়া সাহিত্য :

আঠার শতক পর্যন্ত অসমীয়া সাহিত্যে প্রায় বাংলার মতো কামরূপের ভাষা দেখা যায়। ঊনিশ শতকের সাহিত্য প্রথম শিবসাগর ও ডিব্রুগড়ের ভাষায় লেখা শুরু হয়। এজন্য মনে রাখতে হবে কয়েকজন লেখককে। হেমচন্দ্র বড়ুয়া (কবি, নাট্যকার ও আভিধানিক) (১৮৩৫-৯৬), হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭৯-১৯২৮), লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া (১৮৬৮-১৯৩৯) এবং চন্দ্রনাথ আগরওয়ালা (জন্ম ১৮৬৭)। দেশপ্রেমিক কবি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী 'সাগর সংগীত' (ইংরাজীতে অনূদিত হয়) ও 'তুমি', সামাজিক ও বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের লেখক দণ্ডিনাথ কলিতার 'সাধনা', 'ফুল', 'রগড়', 'দীপ্তি', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সতীর তেজ' প্রভৃতি, ছোট গল্প, উপন্যাসের লেখক দীননাথ শর্মার 'ঊষা' ও 'নোদাই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কথা কবিতা', 'ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত যতীন্দ্রনাথ দুয়াড়া 'বনফুল' লিখে ১৯৫৫ সালে আকাদেমী পুরস্কার পান। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে 'জীয়ন মালিনী'র কবি মফিজুদ্দিন আমেদ এবং ছোট গল্পের লেখক 'সৈয়দ আব্দুল মালেকের নাম করা যেতে পারে। 'স্বজনের সুর', 'পরশমণি' প্রভৃতির মহিলা কবি নলিনীবালা দেবীর এবং আজকালকার

সাহিত্যের পুরাতন কবি ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রঘুনাথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

মারাঠী সাহিত্য ঃ

বার শতকের শেষে মুকুন্দ রাজের সময় মারাঠী সাহিত্যের বিকাশ হয়। তের শতকে জ্ঞান দেবের 'জ্ঞানেশ্বরী' এবং নামদেবের কবিতা এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। ঊনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শ এবং খৃষ্টান মিশনারীদের চেষ্টার ফলে আধুনিক মারাঠী সাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চার হয়। মারাঠী গদ্যের জনক চীপ লুঙ্কর (১৮৫০—১৮৮২), দেশমুখ (লোকহিতবাদী), বালগঙ্গাধর তিলক, পরাঞ্জপে, কেলকার, শঙ্কররাওদেব প্রভৃতি এই সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলেন। রবি-কিরণ-মণ্ডলের মস্তিষ্ক-স্বরূপ মাধব জুলিয়ান, সুধাকরের কবি, কুমুমগ্রাজ, মারধেকার প্রভৃতি কবি আধুনিক মারাঠী সাহিত্যকে নতুন পথে চালিত করেন। 'মামা' ওয়ারেরকার, সুভদ্রা-রচয়িতা কির্লোস্কর, ঐতিহাসিক নাটক-রচয়িতা খাদিকর, বরেয়াকর, আত্রে প্রভৃতি মারাঠী নাট্যকার প্রসিদ্ধ। সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন গাদকারী। উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে হরিনারায়ণ আপ্তে, যোশী, ফাদকে, রাজনৈতিক উপন্যাস-লেখক মাধোলকার,

অরবিন্দ গোখেল, অন্নভান সাঠে, ভাবে, মদ্‌গুলকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উর্দু সাহিত্য :

মুসলমান-যুগে উর্দু সাহিত্যের চর্চা প্রথম হয় দক্ষিণ ভারতে। প্রায় দু'শো বছর পরে উত্তর ভারতে উর্দু-সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এ বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় রাজধানী দিল্লীতে সাহিত্য আলোচনার সুযোগ অনেক কমে যায় ; ফলে সাহিত্যিকরা অনেকেই লক্ষ্ণৌ চলে যান। সেখানের নবাবরা তাঁদের দরবারে এই সাহিত্যিকদিগকে অভ্যর্থনা করেন। ফলে দিহলবী (দিল্লীর) এবং লখ্‌নোয়ী (লক্ষ্ণৌ-এর) দু'রকম উর্দু সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

কাব্য : মীর্জা মহম্মদ রফীক সৌদা (১৭১৩—১৭৮১) উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম :—ঘজল ও কাসিদা সম্বলিত একটি ফারসী দেওয়ান, রুবাইয়াৎ, কিত্বা, তারীখ্, 'তর্জী-বন্দ্,' 'ওয়াসুখ্‌ৎ' প্রভৃতি কবিতা সহ উর্দু দেওয়ান, কাব্যাকারে সুন্দর সুন্দর কাহিনী সম্বলিত মসনবী দেওয়ান, উর্দু কাসিদা প্রভৃতি। খাজা মীর দর্দ (১৭২০—১৭৮৪) খোদা-প্রেমিক, ভগবৎ-প্রেম

উদ্‌ঘাটনকারী স্থফীতত্ত্বমূলক ঘজল বা গীতিকবিতায় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রিসালায়ে-আস্‌রারুস্‌-সলাওয়াৎ (১৫ বৎসর বয়সে লেখা), ওয়াবদাতে-দর্দ (উনিশ বছরে লেখা), ইল্‌মুল্‌ কিতাব, নালায়ে-দর্দ, দেওয়ানে উর্দু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই মীর ও সৌদার যুগকে দিহলবী উর্দু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁদের জীবদ্দশাতেই হসন্‌, মীর তকী প্রভৃতি কয়েকজন উর্দু কবির অভ্যুত্থান হয়।

লখ্‌নোয়ী উর্দুর প্রথম যুগকে নাসিখ ও আতিশের যুগ বলে। শেখ ইমাম বখ্‌শ্‌ নাসিখ্‌ (মৃত্যু ১৮৩৮ খৃঃ) উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি এবং লখনোয়ী কাব্য-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। নানা ছন্দে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ঘজল কবিতা লেখা, উর্দুতে নতুন একটি কাব্য-ধারা বা পদ্ধতি সৃষ্টি এবং একটি কবি-গোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য নাসিখ প্রসিদ্ধ। তাঁর তিনটি 'দেওয়ানের' মধ্যে 'দফ্‌তরে পরীশান্‌' ঘজল, রুবায়ী ও অন্য কবিতায় ভরা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেওয়ানে অনেক বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ ঘটনার তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। আতিশ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছিলেন। আতিশের কবিতায় পাণ্ডিত্য না থাকলেও সরল

স্বাভাবিক রসপ্রকাশের জন্য তাঁর কাব্য সকলকে খুশি করত। আতিশ-কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে 'রিন্দ্', 'সবা', 'খলীল', 'নসীম' (পণ্ডিত দিয়া শঙ্কর কোল), নবাব মির্জা শৌক্ এবং আগা হিজ শরফ্ প্রসিদ্ধ।

এর পর নবাব ওয়াজিদ আলী শা-র যুগ। তিনি অযোধ্যার শেষ নবাব। তাঁর কবি নাম ছিল 'আখ্তর'। তাঁর রাজত্বে অরাজকতার অজুহাতে ইংরেজরা ১৮৫৭ সালে তাঁকে কলিকাতার নিকট মাটিয়া-বরুজে ১৮৮৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অন্তরীণ করে রাখেন। তাঁর প্রাসাদে গান-বাজনা ও নাচের আসর হ'ত। ঠুমরি, দাদরী গানের সুর তাঁর সময়েই বাংলায় প্রচলিত হয়। তিনি 'আখ্তর', 'কাসিদা', 'ঘজল', 'মসনবী' ও 'মরসীয়া' প্রভৃতি অনেক রকম কবিতাই লিখে গেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'শীওয়ায়ে-ফয়েজ' প্রভৃতি ৬টী দেওয়ান, 'হুজনে আখতবী' প্রভৃতি মসনবী-কাব্য, 'জিল্দে-মরাসী' প্রভৃতি মরাসী (শোকগাথা) কাব্য, 'মুরাহিসা-বাইনুল্-নফস্' ও 'অল্-আক্বল্' (অর্থাৎ জ্ঞান ও রিপুর কথোপকথন) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর পর মরসিয়া কাব্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা দবীর ও মীর আনীসের নাম উল্লেখযোগ্য।

দিহলবী উর্দু-সাহিত্যে এক নতুন যুগ আনলেন 'ইন্শা' কবি নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ ইন্শা আল্লা খান এবং 'মুসহফী' (১৭৫১—১৮৪০) নামে প্রসিদ্ধ শেখ ঘুলাম হামদানী। এই যুগে দুটি বিভিন্ন ধারার সমাবেশ হয়েছিল। মুসহফীর দল প্রাচীন ধারা পছন্দ করতেন, ইন্শার দল আধুনিকতা পছন্দ করতেন। ইন্শা উর্দু ঘজলের একটি বৃহদাকার দেওয়ান, 'দেওয়ানে-রীখ্তী', 'শীর ও বরঞ্জ' প্রভৃতি কাব্য লেখেন। মুহসফী ও ইন্শার মুয়র্কা (=মু'অর্কহ বা তর্কযুদ্ধ) বেশ চিত্তাকর্ষক ও এটি উর্দু-সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সাদৎ ইয়ার খান রঙ্গীন (১৭৫৫—১৮৩৫)-এর কয়েকখানি কাব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :— 'মসনবীয়ে দিল্পজীর', 'ইজাদে-রঙ্গীন', 'দেওয়ানে-রীখতা' প্রভৃতি দেওয়ান। বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলম্ 'আফতার' কবি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতের শেষ স্বাধীন বাদশা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও (১৮৩৭-৫৭) একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কবি নাম 'জফর'। কাব্য ছাড়া গানেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

এবার নজীর আকবরাবাদী ও শা নসীরের সাহিত্য-সেবার কথা বলতে হবে। আকবরাবাদী ছিলেন

আধুনিক কবিদের অগ্রদূত, তাঁর কবিতায় কথা ও ভাবের স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট। মীর্জা আসকরী সাহেব ঠিকই বলেছেন, নজীর সৌদা, মীর, ইন্‌শা, আনিস্ ও দবীর-এর মতো শ্রেষ্ঠ কবি না হলেও তাঁর কাব্যে এই শ্রেষ্ঠ কবিদের ভিন্ন ভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছিল। এজন্য তাঁর গুণমুগ্ধ কেউ কেউ তাঁর প্রতিভাকে সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সংগে তুলনা করতে ইতস্ততঃ করেন না। শা নসীরও আধুনিক যুগের অগ্রদূত। এঁদের হু'জনের কাব্যেই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সংযোগ হয়েছিল। দিহলবী যুগের আরও হু'জন কবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—শেখ্ ইব্রাহীম জৌক এবং মৌমিন খাঁ (জন্ম ১৮০০)। জৌক ভাষাকে যেমন মার্জিত করেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যকে রসঘন ক'রে তুলতে পেরেছেন। মৌমিন তাঁর কাব্যের মধ্যে 'তারীখ্' লিখেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মীর্জা আসহুল্লা খান ঘালিব উর্হু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। ঘালিবের গ্রন্থের মধ্যে 'উদে-হিন্দী', 'উর্হুয়ে-মু আল্লা', 'কুল্লিয়াতে নসরে ফার্সী', 'তেঘে তেজ', 'শব্দ-চীন্', 'নামায়ে ঘালিব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রসরচনায় ভরা সমালোচনা গ্রন্থও আছে।

ইংরাজের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা চলে যায়। ফলে দরবারী-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'অন্যের মনোরঞ্জন' উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনও চলে যায়। ইংরেজ ও তাদের সাহিত্যের প্রভাবে চিন্তাধারার যেমন প্রসার হয়েছে, তেমনি কাব্যের গঠন প্রণালীও বদ্‌লে গেছে। ফলে দেশপ্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা এবং অন্য সকল ভারতীয় ভাষার মতো উর্দুতেও গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে; এবং সেই সংগে গদ্য-কবিতারও সূচনা হয়েছে। এই প্রভাবের ফলে যে নতুন সাহিত্য-জগতের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে রয়েছেন হালী, আজাদ, শরর, সরশার, আকবর ইলাহাবাদী, মহম্মদ ইকবাল্ ও হজরৎ মোহানী।

শমস্থল উলিমা আলতাফ হোসেন হালী (জন্ম ১৮৩৭) গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যের রচয়িতা। গদ্যের কথা পৃথক বলা হবে। কাব্যের মধ্যে বর্খারুৎ প্রভৃতি মসনবী কাব্য, 'মুসদ্দসে হালী', 'দেওয়ানে হালী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শমস্থল উলিমা মহম্মদ হোসেন আজাদ আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক। তাঁর 'মসনবীয়ে শবে-ক্কদর্', 'মসনবীয়ে হব্বে-উঅত্বন' প্রভৃতি কাব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রসিদ্ধ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস 'আবেহায়াৎ' ইতিহাস হলেও যেন কাব্যরসে ভরপুর।

আকবর ইলাহাবাদী (জন্ম ১৮৪৬) কাব্যধারায় এক নূতন বৈশিষ্ট্যের সৃজন করেন। তিনি একজন ভারত-বিখ্যাত কবি। আকবর হাস্যরসের কবি হলেও চিন্তাশীল দার্শনিক কবিও বটে। 'আদীব' পত্রিকার সম্পাদক কায়স্থ নজর লখনৌয়ীও একজন স্বভাব-কবি।

ডক্টর স্যার শেখ মহম্মদ ইক্‌বাল (জন্ম ১৮৭৬) উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি না হলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর জন্মস্থান পাঞ্জাবে হলেও তাঁদের আদিবাস ছিল কাশ্মীর। ইউরোপীয় শিক্ষার পর তিনি লাহোরে আইন ব্যবসা করেন, ১৯২২ সালে 'নাইট' উপাধি পান। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'ইলমুল্‌ ইক্‌তিসাদ' (মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে লেখা), 'আসরারে-খুদী', 'বঙ্গে-দরা' (উর্দু কাব্যের সংকলন) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তিনি জার্মানীতে 'ইরাণের দর্শন' লেখে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর উর্দু ঘজল ও অন্যান্য কবিতায় দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণার উদ্দামতাই প্রকাশ পায়। 'হিমালহ' (হিমালয়), 'তরানাহ-ই-হিন্দী', 'হিন্দুস্তানী বচ্চোঁ কা কৌমী-গীৎ' ও 'নয়া-শিবালহ' (বা নব শিবালয়) তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা।

উর্দু-সাহিত্যে আধুনিক রুচির প্রসিদ্ধ উদ্যোক্তা

পণ্ডিত ব্রজনারায়ণ চিক্‌বস্ত (জন্ম ১৮৮২)। তিনি নানা রকম কবিতা লিখেছিলেন—জাতীয় কবিতা, সামাজিক কবিতা, ধর্ম সম্বন্ধে কবিতা, প্রকৃতির কবিতা এবং ভারতীয় প্রসিদ্ধ দেশ-নায়কদের উদ্দেশ্যে বিয়োগ-ব্যথায় ভরা মরাসী কাব্য। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যেও চিক্‌বস্তের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

হসরৎ মোহানী (জন্ম ১৮৭৫) আধুনিক যুগের ঘজল কবিতায় একজন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাসিরী লখ্‌নোয়ী (জন্ম ১৮৮৫), বশীর্‌ হসন্‌ খান জোশ মলীহাবাদী (জন্ম ১৮৯৪), স্বফী কবিনামধারী আলীনক্বী (১৮৬২), জরীফ, জালন্ধরী (জন্ম ১৯০০), আহস্‌ন্‌ দানিশ, আহমদ নদীম ক্বাসিমী (জন্ম ১৯১৬)।

অনুবাদ সাহিত্যও উর্দু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতু সংহার' প্রভৃতি, চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীত' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির বিভিন্ন কবির অনুবাদ অতি উপাদেয়।

গদ্য সাহিত্য ঃ

'আফ্‌সোস' কবি নামধারী মীর শের আলী (মৃত্যু ১৮০৯) কাব্য সাধনার সঙ্গে 'বাঘে-উর্দু' (সাদীর গদ্য

গ্রন্থ গুলিস্তানের উর্দু অনুবাদ), 'আরায়িশে মহফিল' (হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক বিবরণ ও ইসলাম আধিপত্যের বিবরণ) প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। সৈয়দ হয়দারী (মৃত্যু ১৮২৩) 'কিস্সায়ে লয়লামজনু', (অনুবাদ) প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের চেষ্টায় সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদের উর্দু তর্জমা করেন মীর হুসেনী; 'শকুন্তলা' নাটকের ব্রজ ভাষায় অনুবাদ থেকে উর্দু তর্জমা করেন মীর্জা জোওয়ান, "সিংহাসন বত্তীসী" (বত্রিশ সিংহাসন) রচনা করেন জোওয়ান ও লল্লুলালজী; 'গুলে বকাওলী' রচনা করেন নিহাল চন্দ লাহোরী। রজব আলী (মৃত্যু ১৮৬৭) 'ফসানায়ে অজায়েব' গদ্য-গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবি ঘালিব অবসর-বিনোদনের জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার মাধ্যমে গদ্য-সাহিত্যের অতুলনীয় বিকাশ হয়েছিল।

১৮৩২ সালে উর্দু ভাষা সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত হয়। সংবাদ-সাহিত্যকে উর্দু ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (জন্ম ১৮১৭)। তাঁর চেষ্টাতেই আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি আধুনিক চিন্তাধারা অনুসারে কোরাণ শরীফের উর্দু অনুবাদ শুরু করেন—

অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতো। হালী তাঁকে উর্দু গদ্য-সাহিত্যের জন্মদাতা বলে গেছেন। আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের পুরোধা হিসাবে অধ্যাপক রামচন্দ্র উল্লেখযোগ্য। 'তজকিরতুল্-কামিলীন্', (প্রাচীন সভ্য-জগতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও পণ্ডিত-বর্গের সাহিত্য-জীবনের বিবরণ), 'অজায়িবে-রোজগার্' ও 'উসূলে-ইল্‌মে-হয়াৎ' তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। কবি হালী 'তিরিয়াকে-মসমূন্, (১৮৬৮), 'ইন্‌মূল-ত্ববক্কাতুল-আরজ', 'মজলিস্থন্-নিসা' (পুরস্কার প্রাপ্ত), 'মুজামিনে হালী' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। আজাদের 'আবে-হয়াৎ' এর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর অন্য গ্রন্থের নাম—'ফারসী-রীডার', 'ক্বদ্দীম উর্দু রীডার', 'উর্দু কা ক্বাইদা' এবং 'ক্বওআয়িদে উর্দু', 'নয়ী উর্দু রীডার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খান-বাহাদুর মৌলানা নজীর আহম্মদ (১৮৩১) 'বনা-তুলনাশ', 'মুনতিখাবুল হিকাযৎ' প্রভৃতি গল্প উপন্যাস সংক্রান্ত, 'মৎলবুল-কুরান', 'অম্মহাতুল-উম্মতহ ইজতিহাদ' প্রভৃতি উপদেশ-মূলক ও ধর্ম সংক্রান্ত এবং 'স্বফে-স্বঘীর', 'রসমূল খত', 'ক্বানুনে শহাদৎ' (Evidence Act এর অনুবাদ) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন।

নুমানীর (১৮৫৭) ফারসী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নুমানির ভাবশিষ্য সুলেমান

নদ্‌বী শেষ জীবনে 'তস্‌নীফে খইয়াম্‌' নামে উচ্চ দরের গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধ হন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর' উপাধিতে সম্মানিত করেন। লীলা শ্রীরাম (জন্ম ১৮৭৫) তাঁর বিখ্যাত 'খমখানারে জাভয়িদ' লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলী হসন্‌ নিজামী (জন্ম ১৮৭৯), নিজের আত্মচরিত 'আপ-বয়তী' (১৯১৯) লেখেন। তিনি অনেক প্রবন্ধ ও ছোট গল্পও লিখেছিলেন। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (জন্ম ১৮৮৬) তাঁর 'অল হিলাল'এর সম্পাদনার মাধ্যমে সাহিত্যিক প্রতিভার যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তাতেই তাঁকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক-রূপে গ্রহণ করা যায়। তাঁর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের সুপরিমিত ও সুসামঞ্জস ব্যবহার। তাঁর প্রধান কীর্তি তাঁর 'কোরাণের অনুবাদ'। তাছাড়া অল্‌-হিলালে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি 'মক্কালাতে আজাদ' এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর হবীবর রহমানকে জেলখানা হ'তে লেখা পত্রের সমষ্টিও 'ঘব্‌বারে খাতির' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আবদুল-মাজিদ্‌ দরিয়াবাদী (জন্ম ১৮৯৩) সাহিত্যে, দর্শনে ও আলোচনায় নাম করলেও সকলপ্রকার সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ফিলসফয়ে জজ্‌বাৎ, মুকালমাতে বর্কলে

(অর্থাৎ বিখ্যাত লেখক বার্ক্লি সাহেবের ইংরাজী বই-এর অনুবাদ); সাইকলজী অব্ লিডারশিপ, তসওঅফে-ইস্লাম প্রভৃতি। উস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষার অধ্যাপক আধুনিক-পন্থী ডক্টর মহীউদ্দীন জোর বার-তেরখানি সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনার মধ্যে 'কুল্লিয়াতে সিরাজ' এবং 'কুল্লিয়াতে কুতুবশাহ' উল্লেখযোগ্য। 'ইদারায়ে আদবিয়াতে-উর্দু' নামে সংস্কৃতি সম্মেলন তাঁর প্রধান কীর্তি। ইহ্তিশাম্ হুসেন (জন্ম ১৯১৩) একজন স্বভাব-সাহিত্যিক। তাঁর কয়েকটি সাহিত্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য—'তন্‌ক্বীদে জায়িজে' (সমালোচনা), 'আদব ও সমাজ', 'উর্দু লিসানিয়ৎ কা খাকহ্ (ভাষা-সম্বন্ধীয় একটি অনুবাদ গ্রন্থ), ওয়েরানে (ছোট গল্পের সমষ্টি) এবং 'তন্‌ক্বীদ্ অওর্ আমলী তন্‌ক্বীদ' প্রভৃতি বিখ্যাত।

উপন্যাস ও ছোট গল্প ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চেষ্টায় সংস্কৃত ও ফারসী গ্রন্থের উর্দুতে অনুবাদ করা হয় এবং ঐতিহাসিক নিবন্ধ বা গল্প ও কাহিনী লেখা হয়। এইভাবে ক্রমে উর্দু সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোট গল্পের সূচনা হয়। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি

লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত নবল কিশোর প্রেস হতে সম্পাদিত গল্প ও কাহিনী সম্বলিত 'দাস্তানে আমীর হম্‌জা' এবং 'বোস্তানে খয়াল' বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথম বইটি উর্দু ও পারস্য সাহিত্যের সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী ও রূপকথার ভাণ্ডার। সরশার নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রতন নাথ দর (জন্ম ১৮৪৬) একাধারে কবি, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, ভাষাবিদ ও সর্বোপরি ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী ধারা অনুসারে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। 'ফসনায়ে আজাদ' (১১৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন) উপন্যাস ছাড়াও 'জামে-সর্‌শার', 'কামিনী', 'খুদায়ি-ফৌজদার', 'বিছড়ি হুল্‌হন্', 'হুশশূ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গদ্যকার নজীর আহমদ বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর 'মিরাতুল আরূস'ই বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের আদি খাঁটি উপন্যাস। এছাড়া তাঁর 'বনাতুন্-নঅশ', 'তৌবতুন্ নস্থূহ', 'অইয়ামা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৌলবী শরর্ (জন্ম ১৮৬০) মুসলীম ঐতিহ্যের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'মুকদ্দস্ নাজনীন্' 'মনসূর মোহনা', 'ফ্লোরা-ফ্লোরেণ্ড', 'মফ্‌তুহ-ফাতেহ' প্রভৃতি এই জাতীয় উপন্যাস। তিনি 'দিলচস্‌প' (তাঁর প্রথম লেখা), বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র অনুবাদ তাঁর দ্বিতীয়

গ্রন্থ 'বদরুন্-নিসা কী নস্বীবৎ' (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসেও খ্যাতি অর্জন করেন।

মুন্সী সজ্জাত হুসেন উর্দু-সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন।

এ যুগের অধিকাংশ উপন্যাসই অন্যান্য ভাষা হ'তে সংগৃহীত গ্রন্থাদির সংকলন বা অনুবাদমাত্র। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অনেক উর্দু মৌলিক উপন্যাস হ'তেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে :—'জোরে-ফলক' (ইস্ট লাইন হতে মীর্জা মহম্মদ কর্তৃক অনূদিত); ব্রিজ কুমারীকৃত 'জরয়ে আজীম্' (মাইটি এ্যাটম-এর অনুবাদ) এবং খুজস্তা আখতব্ সুহরও-আর্দী-কৃত 'আয়নায়ে ইবরৎ' শ্রীমতী হালিবার্টন্সের বই-এর অনুবাদ)। মহম্মদ আলী ত্বীর 'গোরা', 'জাফর-আব্বাস', 'হুসনে-সরও অর', 'আখ্তর ও হসীন' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছিলেন। মহিলা ঔপ-ন্যাসিকদের মধ্যে মহম্মদী বেগের 'শরীফ-বেটী' এবং উআলিদায়ে মহম্মদ সুলেমানের 'ইস্লাহ উন্নিসা' প্রসিদ্ধ। এছাড়াও নজরে নজ্জাদ হায়দার, উআলিদা আফজল আলী, বেগম শাহ নোআজ এবং জীয়া বানু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রাশিদুল খয়রী বোধ হয় উর্দু সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখে প্রসিদ্ধি লাভ

করেছেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে মুসলীম সমাজে যে সকল কুসংস্কার দেখেছেন তার প্রত্যেকটি নিয়েই তিনি উপন্যাস রচনা ক'রে গেছেন। 'সৌকন কা জলাপা', 'সন্‌জোগ', 'সাত রূহোন্‌কে আমল্‌নামা' এবং 'গৌহরে মক্‌সূদে'ও এই কুপ্রথারই বিষময় ফল চিত্রিত হয়েছে। তাঁর 'আরুসে কর্‌বলা' প্রভৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রসিদ্ধ।

প্রেমচন্দ, নিয়াজ ফতেহপুরী, মুহম্মদ অস্‌লাম্, আজীম্ বেগ চঘ্‌তাই এবং সজ্জাৎ জহীর প্রভৃতি সকলে ছোট গল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও উপন্যাসেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা কম নয়। অস্‌লমের 'নাজ্মিহ কী আপবয়তী' (বা নাজিমার আত্মকাহিনী), সজ্জাত জহীরের 'লণ্ডন কী য়করাত' এবং প্রেমচন্দের 'বাজারে হুসন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পেই প্রেমচন্দের অধিক প্রসিদ্ধি। তাঁর 'প্রেম পচ্চিসী', 'প্রেম বত্তিসী' প্রভৃতি তাঁর গল্পসংগ্রহ। উর্দু সাহিত্যে ছোট গল্পের অভ্যুত্থান সূচিত হয় মুন্সী সজ্জাদ হুসেনের 'অওধ্ পঞ্চ' (১৮৭৭) প্রকাশের সময় থেকে। এর মাধ্যমে যে সকল হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গচিত্রের প্রকাশ হয়েছে তার মধ্যে চরিত্র বিশ্লেষণেরও কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 'মখজন' পত্রিকার সম্পাদক, পঞ্জাব মন্ত্রীসভার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী (১৯২৫) ডক্টর আবদুল কাদির

উর্দু সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করেছেন এবং এঁর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সৈয়দ সজ্জাদ হয়দর বোধ হয় উর্দু সাহিত্যের সর্বপ্রথম ছোট গল্প লেখক। তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে 'লয়লা মজনু' 'খয়ালিস্তান', 'নিকাহে-সানী', 'অজ্ দ্ওআজে মুহব্বৎ' ও 'স্থুহবতে নাজিন্স' এবং হাস্যকৌতুকপূর্ণ 'চিড়ে চিড়িয়া কা কহানী', 'হজরতেদিল কী সওআনেহ উমরী' এবং 'সৌদায়ে সন্‌গীন' বিখ্যাত। আহমদ শুজাই বোধ হয় সর্বপ্রথম ছোট গল্পের সামান্য কাহিনীকে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে বিশ্ব ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিক বিশেষত্ব পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখা 'হুসন্ কী ক্বীমৎ অওর দুসরে আফসানে' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

মহিলা ছোট গল্প লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আব্বাসী বেগমের 'গরীফ্-তারে-ক্বফস্', 'জুলুমে বেকসান' এবং 'দো-শাহজাদী' এবং নজ্বরে সজ্জাদ হয়দারের 'খুনে-অরমান্', 'হুরে স্বহরান্' 'নৈরঙ্গে-জমানহ' এবং 'হক্ ব-হক্ দার'। খাতুনে অকরাম এবং হিজার ইমতিয়াজ আলী তাজ (হিজার ইসমাইল) ভাল ছোট গল্প লেখিকা ছিলেন।

রশিদা জ্বফরের 'আউরৎ অওর দুসরে অফসানে' নামক ছোট গল্প সংগ্রহে যে সকল ভাবধারা লক্ষিত

হয় তার প্রত্যেকটিতেই বিদ্রোহের সুরই ঝঙ্কত হয়েছে। আলী সর্দার জাফরীর চিন্তাধারা আরো বিদ্রোহাত্মক। বর্ণবৈষম্য বা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি আরো কঠোর হস্তে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর 'মনজিল' নামের ছোট গল্প সংগ্রহের প্রত্যেকটি গল্পই এরূপ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। 'মুস্বীবৎ' নামক ছোট গল্প সংগ্রহের লেখক হয়াতুল্লা আনস্বারীও এরূপ বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত করেছেন কিন্তু তাতে কৌতুকের আমেজ থাকায় তাঁর ছোট গল্প তেমন তিক্ত হয়নি। কবি হিসাবে জালন্ধরী সাহেবের আলোচনা আগে করলেও ছোট গল্প হিসাবে তাঁর 'আফসানা দর ফসানা', 'হোশিয়ার দেওআনা', এবং 'খুদকুশী' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ব্যঙ্গচরিত্র রূপায়ণে শৌকৎ থানবীর 'স্বদেশী রেল'ই উর্দু সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। তবে আধুনিক যুগের মির্জা ফরহৎ উল্লা বেগই খাঁটি কৌতুকপ্রিয় লেখক। মুল্লা রুমুজীর লেখনী যেমন হাস্য-সমুজ্জ্বল তেমনি ব্যঙ্গার্থক ও গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। আজীম বেগ চুঘ্‌তায়ীর হাস্যরসাত্মক ছোট গল্পের মধ্যে 'কোল-তার' এবং 'শরীর বীবী' গল্প সংগ্রহই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কনহিয়ালাল কপুর অতি আধুনিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ শ্লেষাত্মক হাস্যরসিক সাহিত্যিক ও গল্প লেখক।

নাটক ঃ

উর্দু সাহিত্যে নাটকের সূচনা হয় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি। উর্দু নাটক বিশেষ করে প্রভাবান্বিত হয়েছে সমসাময়িক চালু বাঙ্‌লা, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অভিনীত কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান ও অন্যান্য ধর্মমূলক যাত্রাভিনয় দ্বারা। প্রথম উল্লেখযোগ্য উর্দু নাটক 'ইন্দর সভা' নবাব উআজিদ আলীশা'র ইচ্ছায় আমানৎ সংগীত লহরীতে পূর্ণ কাব্যাকারে প্রণয়ন করেন। সর্বপ্রথম উর্দু স্টেজ স্থাপয়িতা হলেন শেঠ পেস্তনজী ফ্রামজী। পার্শী থিয়েটার কোম্পানীর জন্য প্রথম উল্লেখযোগ্য উর্দু নাটক রৌনকের 'ইন্‌স্বাফে মহমুদ শাহ' (১৮৮২) এবং জ্বরীফের 'নতিজয়ে অস্ব্‌মৎ', 'খুদা-দোস্ত', 'চান্দ-বীবী' এবং 'বুলবুলে বীমার'। ভিক্টোরিয়া নাটক কোম্পানীর (দিল্লী) নিযুক্ত নাটক রচনাকার বিনায়ক প্রসাদ বেনারসী (মৃত্যু ১৯১৪) 'বিক্রমবিলাস', 'নাজান', 'গোপীচন্দ', 'হরিশ্চন্দর' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। অহসন্‌ লখনোয়ী অলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর নাটক রচনাকার হিসাবে 'হমলেট', 'চন্দ্রাবলী', 'ভুলভুলিয়াঁ', 'বকাওআলী' প্রভৃতি নাটক লেখেন। নরায়ণ পরশাদ বেতাব দিহলবী 'কৎলে-নজ্বীর', 'মহাভারত' (১৯১৩), 'রামায়ণ', 'পত্নী-পরতাপ' 'কিষণ-সুদামা', 'জহরী সাঁপ' প্রভৃতি নাটক লেখেন।

হশর-কাশ্মীরী যেমন ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাটক উর্দুতে অনুবাদ করেছেন, তেমনি তাঁর 'নেক্-পরবীন', 'শহীদে-নাজ', 'মুরীদে-শক', 'অসীরে হিস্', 'তুর্কীহুর', 'মীঠী ছুরী' প্রভৃতি উর্দু মৌলিক নাটকও উল্লেখযোগ্য। 'গঙ্গা উতরণ', 'সুরদাস', 'সীতার বনবাস', 'বনদেব' প্রভৃতি হিন্দী নাটকও তাঁর রচনা। হশরকে বাঙ্গালী নাট্যকারও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ, তিনি যেমন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও রঙ্গমঞ্চের ডাইরেক্টর তেমনি একজন প্রসিদ্ধ নাটক রচয়িতাও ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন হাফিজ মহম্মদ আব্দুল্লাহ, নজীর বেগ আকবরাবাদী, মুন্সী ঘুলাম আলী দেওয়ানা, মুন্সী মহম্মদ ইব্রাহীম মহশর অম্বালবী এবং মুন্সী রহমৎ আলী। এঁদের নাটকের মধ্যে ইব্রাহীম মহশরের 'নিগাহেনাজ', 'শকুন্তলা', 'মীরাবাঈ' ও 'জঙ্গে-জর্মণ' এবং রহমৎ আলীর 'দর্দে জুগর', 'মুহব্বৎ কা ফুল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে যেসব নাট্যকার প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখের যোগ্য বিসম্বর সহায় দিয়াকুল। 'বুদ্ধদেব' তাঁর সার্থক রচনা। মুন্সী জ্ঞানেশ্বর

প্রসাদের 'নূরে হিন্দ্ তথা চন্দ্রগুপ্ত' ও 'তেঘে সিতম্' এবং লালা কুঁওর সেনের 'ব্রহ্মাণ্ড' নাটক সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কুঁওর পরে কাশ্মীর উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। 'হেজার দস্তান'-এর সম্পাদক আহম্মদ শুজা যেমন ঔপন্যাসিক তেমনি নাট্যকারও ছিলেন। 'বাপ-কা-গুণাহ', 'ভারত-কা-লাল' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। রাধে-শ্যাম হিন্দুপুরাণের ঘটনা নিয়ে কয়েকখানি উর্দু নাটক রচনা করেছিলেন এবং সুদর্শন কয়েকটি হাস্য-কৌতুকপূর্ণ নাটক লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কালিদাসের 'বিক্রম উর্বশী' অনুবাদ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন আজীজ মির্জা। প্রসিদ্ধ উর্দু নাট্য ইতিহাস 'নাটক-সাগর'-এর যুগ্ম-সম্পাদক নূর-ইলাহী এবং মুন্সী মহম্মদ উমর মিলিতভাবে অনেক বিদেশী গ্রন্থের উর্দু নাট্য রূপ দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রূহে-সিয়াসৎ' (আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী অবলম্বনে), 'জানে-জ্বরাফৎ' (ফরাসী নাট্যকার মৌলিয়ারের একটি ব্যঙ্গ নাটকের উর্দু অনুবাদ), 'বিগড়ীদিল' (মৌলিয়ারেরই আর একটি ব্যঙ্গ নাটক), 'রুজাক্' (জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলরের 'রবার' গ্রন্থের উর্দু নাট্যরূপ), 'জ্বফর কী মৌৎ' (মিটরলিঙ্কের একটি আধ্যাত্মিক নাটকের উর্দু নাট্যরূপ) প্রভৃতি।

উর্দু সামাজিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর 'জদ-পশিমান' (বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে), আবদুল হলীম শরর-এর 'মেওয়ায়ে তল্‌খ, (পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে) এবং পণ্ডিত ব্রিজমোহন দত্তাত্রিয় কৈফীর 'রাজদুলারী' এবং 'মুরারী-দাদা' প্রসিদ্ধ। নাট্যসাহিত্য সমালোচক কুঁওর সেন ব্রিজমোহনকে 'বার্ণার্ড-শ'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়েও উর্দু নাটক লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কিশেন চন্দের 'জেবা-র জখ্‌মী-পঞ্জাব' উল্লেখযোগ্য। এতে অসহযোগ আন্দোলনে পঞ্জাবের দানের ছবি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান সাহিত্য, সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কাব্য। সেই কাব্যের সাধনা সম্বন্ধে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ালী বলেছেন :—

খুব রূ খুব কাম করতে হায়ঁ ;
এক নিগা মেঁ ঘুলাম করতে হায়ঁ।
দিল হুয়া হায় মরা খরাব স্বখুন ;
দেখ্ কর হুসনে-বে হিজার স্বখুন।
বুজমে-মানী মেঁ সরখুশী হায় উসে ;
জিস কো হায় নিশায়ে-শরাব স্বখুন।
রাহে মজমুনে তাজা বন্দ নহীঁ ;
তা কিয়ামৎ খুলা হায় বাবে স্বখুন।

গৌহর উসকী নজর মেঁ জা না করে ;
জিস নে দেখা হায় আবও তাবে সুখুন।
হায় সুখুন জগ মেঁ আদীমূল মসল ;
জুজ সুখুন নহীঁ দুজা জবাবে সুখুন।
শয়র ফহমুন্ কী দেখ কর গর্মী ;
দিল হুয়া হায়ঁ মরা কবাবে সুখুন।

* * *

আয় ওয়ালী দর্দে-সর কভু না রহে ;
জব্ মিলে সন্দিল ও গুলাবে সুখুন।

অর্থাৎ, সুন্দর মুখের জয়—চক্ষের পলকে সে (সকলকে) ঘুলাম (গোলাম) করে। কাব্যের অনাবৃত মুখ দেখে আমার দিল পাগল-প্রায়। কাব্যই যাঁর মদের নেশা, কবি-সভায় তাঁরই সম্মান। নতুন ভাবধারা কখনও বন্ধ হয় না, কারণ, শেষদিন পর্যন্ত কাব্যদ্বার খুলা থাকবে। যে কাব্যের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছে, তার চোখে টাকা পয়সার বিশেষ মূল্য নেই। জগতে কাব্যই অমূল্য সম্পদ—এই উভয় পৃথিবীতে কাব্যের সমতুল্য কেবল কাব্যই। কাব্যের ভাব-সমৃদ্ধি লক্ষ্য করে আমার মন বিদগ্ধ হয়ে গেছে। * * * হে ওয়ালী, যখন কাব্যের গোলাপ ও চন্দন প্রবাহিত হয়, তখন আমার আর কোন দুঃখ নেই।

চির সুন্দরের আরাধনা ঃ

এতক্ষণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নৃত্য, গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হোল তার সৃজন ‘সুন্দর’কে পাওয়ার জন্য এবং অপর পাঁচজনকে দেখাবার বা শোনাবার জন্য। এ সবগুলিরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে ‘সুন্দরম্’। আমাদের প্রাচীন ঋষি মনীষিগণ ‘সুন্দরম্’ অর্থাৎ একেবারে নিখুঁত সৌন্দর্যের সাধনা করতে শিখিয়ে গেছেন নানা শাস্ত্র ও কাজের মধ্য দিয়ে। ভারতের মধ্য যুগে এ সাধনায় ব্যাঘাত পড়েছিল সত্যি, কিন্তু আজ আমরা আবার আগের মতো স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও এই স্বাধীনতার সুযোগ পেয়ে নানাভাবে আমাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল উৎসাহই দিতে পারেন। ভারতের পবিত্র মাটিতে জন্মে প্রাচীন সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে আমাদের আজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই অমূল্য ধনকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুন্দরের সাধনা করতে করতেই আমরা ‘চির সুন্দর’কে পাব, তাঁর আশিস লাভ করব সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত